বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধীনে
এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া

অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

জহুরা আক্তার

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৯৭
সেশন- ২০০৯-২০১০
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধীনে
এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)

গবেষক

জহুরা আক্তার

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০১৫

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এম.ফিল গবেষক জহুরা আক্তার কর্তৃক **'বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)'** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল বা পিএইচ.ডি. ডিগ্রির উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি উক্ত অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে এ অভিসন্দর্ভের উপর গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়া)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **'বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)'** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। এটি কোনো যুগ্মকর্ম নয়, বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য লিখেছি। উল্লেখিত শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করিনি।

স্বাক্ষর

(জহুরা আক্তার)
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-১৯৭
সেশন-২০০৯-২০১০
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমে মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যার রহমত না পেলে এই গবেষণাকর্ম প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না। বিশ্বের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি রইল অসংখ্য সালাম।

আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মোঃ জামাল উদ্দিন ও আমার মাতা হামিদা জামান এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যাদের উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম আমাকে উচ্চশিক্ষার পথ দেখিয়েছে। আমার জীবনসঙ্গী মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন (এডিশনাল এস.পি, বাংলাদেশ পুলিশ) যার অকৃত্রিম সহযোগিতায় আমি আমার এ গবেষণাকর্মকে চূড়ান্ত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়াও আমার বন্ধু নরসিংদী সরকারী কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক, নজিবুল্লাহ সাকি এবং আমার ভাগিনি মেহজাবিন বিনতে মামুনসহ সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মোঃ মুহসীন উদ্দীন মিয়ার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার এ গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন। এছাড়াও উক্ত বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে তথ্য নির্দেশনা দিয়ে উপকৃত করেছেন।

আবার মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত আমার শ্রম ও সাধনার সাফল্যের আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি।

এম.ফিল গবেষক
জহুরা আক্তার
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

অধ্যা.	:	অধ্যাপক
অনু.	:	অনুবাদ
অনূ.	:	অনূদিত
(আ.)	:	আলাইহিস্ সালাম
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি.পূ.	:	খ্রিস্ট পূর্বাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর(পিএইচ.ডি.)
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
বাং	:	বাংলা সন
মাওঃ	:	মাওলানা
মু./মুহা.	:	মুহাম্মদ
মৃ.	:	মৃত্যু
(রহ.)	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
(রা.)	:	রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
(সা.)	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সম্পা.	:	সম্পাদিত
সে.	:	সেলসিয়াস
হি.	:	হিজরী সাল
Vol.	:	Volume.
ed.	:	edited by.
edn.	:	edition.
Dr.	:	Doctor(Ph.D.)
Ibid.	:	Ibidem(in the same place).
P.	:	Page.
Pp.	:	Pages.
U.S.A.	:	United State of America.

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

আলোচ্য বিষয়		পৃষ্ঠা নং
	প্রত্যয়ন পত্র.....	i
	ঘোষণা পত্র.....	ii
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....	iii
	সংকেত সূচি.....	iv
	সূচিপত্র.....	v-vi
	প্রস্তাবনা.....	**১-৩**
প্রথম অধ্যায় :	**বাংলাদেশ ও ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং দুদেশের মধ্যকার সম্পর্কের ঐতিহাসিক যোগসূত্র.....**	৪-৩৯
	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়.....	৫
	ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়.....	২১
	বাংলাদেশ ও ইরানের ঐতিহাসিক যোগসূত্র.....	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায় :	**বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা.....**	৪০-৯২
	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস.....	৪১
	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা.....	৬২
	ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস.....	৭১
	ইরানের ইসলামি বিপ্লবে বাংলাদেশের ভূমিকা.....	৮৪
তৃতীয় অধ্যায় :	**বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতি.....**	**৯৩-১২৪**
	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য.....	৯৬
	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় ও উদ্দেশ্য.....	৯৭
	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য.....	১০০
	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতি-প্রকৃতি.....	১০২
	ইরানের পররাষ্ট্রনীতি.....	১০৭
	ইরানের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য.....	১০৯
	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে বিপ্লবোত্তর ইরানের পররাষ্ট্রনীতি.	১১৪
	বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক সামঞ্জস্য.....	১১৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের রাজনীতি ও বাংলাদেশের ভূমিকা..... ১২৫-১৫৯

ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা..... ১২৬

ইরান-ইরাক যুদ্ধের (১৯৮০-১৯৯০) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..... ১৪০

ইরান-ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-১৯৯০) বাংলাদেশের অবস্থান..... ১৪৬

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক..... ১৬০-২০৩

বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট..... ১৬১

বাংলাদেশ ও ইরানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক..... ১৬৭

বাংলাদেশ ও ইরানের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্ক..... ১৭১

বাংলাদেশ ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক..... ১৭৭

বাংলাদেশ ও ইরানের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক..... ১৭৮

শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক..... ১৮১

৭১' পরবর্তী বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন চুক্তি ও যোগাযোগ..... ১৮৫

বাংলাদেশের ও ইরান সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি..... ১৯৬

উপসংহার ২০৪-২০৫

গ্রন্থপঞ্জি..... ২০৬-২১৮

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ
বাংলাদেশ ও ইরানসম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)

জহুরা আক্তার
এম.ফিলগবেষক
রেজিষ্ট্রেশননং- ১৯৭
সেশন- ২০০৯-২০১০
ফারসিভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।

চাবিশব্দ: বাংলাদেশ, ইরান, ফারসিভাষা, বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, ইসলামিবিপ্লব।

প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গীয় অঞ্চলের সাথে ইরানেরএকটাঘনিষ্ঠসম্পর্ক ছিল। বাংলা ও ইরানেরআদিবাসীআর্য সম্প্রদায়ের একই রক্ত বাহিত এ দুইজাতিসংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যেরবিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইরানশাসনতান্ত্রিকধারায়রাষ্ট্র পরিচালিতহওয়ার পর একে অপরেরভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিএবং অর্থনীতিতেগভীরভাবেপ্রবেশকরে দুটিজাতিইবিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সময়েরআবর্তনে বাংলার সাথে ইরানেরসম্পর্ক পরিবর্তিতরূপপরিগ্রহকরে।ইংরেজরাবাংলারক্ষমতায়আরোহণের পর ইরানিদের প্রভাব খর্ব হলেওতাদের ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এ অঞ্চলেরশিক্ষিত ও উঁচু শ্রেণিতে বিদ্যমানছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর মুসলিম দেশ হিসেবেপাকিস্তানের সাথে ইরানেরসম্পর্কেরনতুনমাত্রা যুক্ত হয়। অন্যান্য মুসলিম দেশেরন্যায়একটামুসলিম দেশের বিভক্তি নাহওয়ারজন্য ১৯৭১ সালেবাংলাদেশেরমহান মুক্তিযুদ্ধে ইরাননীতিগতভাবে স্বাধীনতারবিপক্ষেঅবস্থানগ্রহণকরে। ১৯৭৫ সালেইরানসরকারবাংলাদেশকে স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিপ্রদানকরলেউভয় দেশেরমাঝেপুনরায়সম্পর্কেরসূচনা ঘটে। মুলত ১৯৭৫ সাল থেকে ইরানের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিকরাষ্ট্রিয়সম্পর্ক স্থাপিতহয়। সেই সাথে শুরুহয়সম্পর্কেরবহুমুখি লেনদেন যাবর্তমানেওবাধাহীনভাবেঅব্যাহতআছে। আলোচ্য **'বাংলাদেশ ও ইরানসম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)'** শীর্ষকঅভিসন্দর্ভে ইরানের সাথে বাংলাদেশেরসম্পর্কেরবিভিন্নদিক ও বিভিন্নরূপ তথ্যবহুলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টাকরাহয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ ও ইরানের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার (৩৩০ খ্রি.পূ.) এর সময় হতে ইরানিরা প্রথমে অর্থ-বিত্তের লোভে পুরো ভারতবর্ষে হামলা চালায়। পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য ও জীবিকার তাগিদে পারস্পরিক আসা যাওয়ার মাঝে গড়ে ওঠে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক। ইসলাম পরবর্তী সময়ে শাসন ব্যবস্থা, ধর্ম প্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এ অঞ্চলে তাদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা এ বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে তাদের সুশাসন ও ধর্মপ্রচার। বিশেষ করে এ দু'টি বিষয়ে ইরানিরা এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও ইরান তার পাকিস্তান নীতির কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ইরান স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে দুই দেশের মাঝে নতুন সম্পর্কের সূচনা ঘটে। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হলেও দুদেশের মাঝে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ইরানের পরিবর্তিত সরকার ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছাড়াও অর্থনীতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমানে এ দু'দেশের মাঝে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তেল আমদানি, জনশক্তি রফতানি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উপকরণসহ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সাবলীল গতিতে প্রসার শুরু করে। এ ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ চালু করা, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, ইরানের উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ইরান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১৯৮০-৮৮ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৮৮ সাল পরবর্তী সময়ে ইরানের সাথে বাংলাদেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকলেও আমেরিকার অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

অবরোধের কারণে সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে পড়ে। ১৯৯০ সালের পর ইরানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সকল ইস্যুতে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রফসানজানির বাংলাদেশ সফর করলে এ সম্পর্ক আরো গতিশীলতা লাভ করে। ১৯৯৭ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ৮ম ওআইসি'র সম্মেলনে শেখ হাসিনার যোগদানে উভয় দেশের সম্পর্ক শক্তিশালী রূপ নেয়। বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের নিয়মিত যাতায়াত এ সম্পর্ককে সুদৃঢ় রাখছে। সাথে সাথে বাংলাদেশের জনশক্তি, শিল্প কলকারখানা, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক খাতে উভয় দেশের সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়কে তথ্যনির্ভর ও বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে, বাংলাদেশ ও ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং দুদেশের ঐতিহাসিক যোগসূত্র শিরোনামে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ও ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, শাসনতন্ত্র, রাজনৈতিক ইতিহাস এবং দুদেশের ঐতিহাসিক যোগসূত্র ও সম্পর্কের একটি ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা শিরোনামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা পূর্বক স্বাধীনতা আন্দোলনের যৌক্তিকতা, পাকিস্তানের শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং ইরানের ইসলামি বিপ্লবের ওপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ইরানের ভূমিকা ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে তথ্যনির্ভর আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতি শিরোনামে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় ও উদ্দেশ্য এবং ইরানের পররাষ্ট্রনীতি ও ইরান-বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক সামঞ্জস্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে, ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের রাজনীতি ও বাংলাদেশের ভূমিকা শিরোনামে ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি চিত্র এবং ইরান-ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-১৯৮৮ সাল) বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক শিরোনামে বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ইরানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ ও ইরানের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্ক, বাংলাদেশ ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ ও ইরানের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক, শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক, ১৯৭১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও যোগাযোগ এবং বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্কের গতি-প্রকৃতির ওপর তথ্যনির্ভর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সবশেষে গবেষণাকর্মের সারসংক্ষেপ তথ্য 'উপসংহার' উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার, বেগম সুফিয়া কামাল পাবলিক গ্রন্থাগার, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস ও বাংলা একাডেমি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার সুযোগ ও সহযোগিতা লাভ করেছি। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সবার উপদেশ ও নির্দেশনাকে স্মরণ করছি। আমার এ গবেষণা কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশ ও ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং দুদেশের মধ্যকার সম্পর্কের ঐতিহাসিক সূচনা

১. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

২. ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩. বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং দুদেশের মধ্যকার সম্পর্কের ঐতিহাসিক সূচনা

বিশ্বের মানচিত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে ইরানও এশিয়ার অন্যতম একটি মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে স্বীকৃত। একই ভূ'ভাগে অবস্থান হওয়ার পরও দূরত্ব ও দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তের কারণে ইরানের সাথে আমাদের যোগাযোগ অনেকটা সংকুচিত। ভাষা-সাহিত্য, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কারণে মনের দিক থেকে ইরানকে অত্যন্ত কাছেই গণ্য করা হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে গুপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পরিচিতি, জলবায়ু, শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সাংবিধানিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

১. বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এদেশে প্রাচীনকাল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে সীমা রেখারও পরিবর্তন হয়েছে। শুধু ইংরেজ আমলেই কয়েকবার বিভিন্ন প্রদেশের সাথে বাংলার কোনো কোনো অংশ যুক্ত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে বাংলার পশ্চিমাংশ ভারতের এবং পূর্বাংশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়ে প্রথমে পূর্ব বাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তান নাম ধারণ করে। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সুদীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে পৃথক হয়ে শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পথচলা। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হল বাংলাদেশ। জনশক্তি রপ্তানি, গার্মেন্টস শিল্প এবং জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অবদানের জন্য এ দেশটিকে এশিয়ার অন্যতম দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের বিবর্তনের ধারায় এশিয়া মহাদেশের হিমালয়ের দক্ষিণে ও বঙ্গোপসাগরের উত্তরে জেগে উঠা পলিজ ভূ-ভাগ হল বাংলাদেশের অবস্থান। প্রাচীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেন–

> উত্তর সীমা: বিশিস্ট প্রাকৃতিক সীমায় সীমিত, জাতি ও ভাষার একত্ব বৈশিস্ট্য লইয়া আজিকার যে বাংলাদেশ এই দেশের উত্তর সীমায় সিকিম এবং হিমালয়-কিরীট কাঞ্চজঙ্গার শুভ্র-তুষারময় শিখর, তাহারই নিম্ন উপত্যকায় বাঙলার উত্তরতম দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা।
>
> পূর্ব সীমা: বাঙলার পূর্ব-সীমায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া, ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, ও চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা।
>
> পশ্চিম সীমা: বাঙলার বর্তমান পশ্চিম-সীমা পূর্ব সীমাপেক্ষাও অধিক খর্বীকৃত হইয়াছে, উত্তর প্রান্তে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম-সীমাই আধুনিক বাঙলার সীমা নির্দেশ করিতেছে। অথচ প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সীমার দক্ষিণে গঙ্গার তট বহিয়া একেবারে বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম-সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
>
> দক্ষিণ সীমা: বাঙলার দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তাহারই তট ঘিরিয়া মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগণা-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত (অর্থ্যাৎ চাঁদপুর) নোয়াখালী-চট্টগ্রামের সমতট ভূমির সবুজ বনময় অথবা শস্য শ্যামল আস্তরণ।[১]

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।[২] এ ভূখণ্ডের সীমারেখার বেশির ভাগই ভারতের সাথে এবং একটি ক্ষুদ্র সীমান্ত মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত। বাংলাদেশ-ভারত সীমানার মোট দৈর্ঘ্য ৩৭৪০ কিলেমিটার এবং মায়ানমারের সাথে সীমানার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ কিলোমিটার। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগররেরর উপকূল রেখায় বাংলাদেশের মোট সমুদ্র সীমার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭২০ বর্গ কিলোমিটার।

বংলাদেশের অবস্থান ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।[৩] বাংলাদেশের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, মেঘালয় রাজ্য, গারো ও খাসিয়া-জয়ন্তি পাহাড়ের পাদভূমি। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও

Dhaka University Institutional Repository

মিজোরাম রাজ্য। দক্ষিণ পূর্বে মায়ানমার (বার্মা)। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি বিদ্যমান।

২০১১ সালে জনসংখ্যা জরিপে বাংলাদেশের লোক সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার তিনশত চৌষট্টি জন। এর মাঝে ৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮০ হাজার তিনশত ছিয়াশি জন পুরুষ ও ৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯১ হাজার নয় শত ছিয়াত্তর জন মহিলা।[৪]

বাংলাদেশ উষ্ণ-আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ুসম্পন্ন দেশ। জানুয়ারি মাস সবচেয়ে ঠাণ্ডা প্রবণ এ সময়ে গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৬° সে. এবং এপ্রিল মাস সবচেয়ে বেশী গরম অনুভূত হয়। এ সময়ে গড় তাপমাত্রা ৩৩° সে. হতে ৩৬° সে. পর্যন্ত উঠানামা করে। বছরে প্রায় ১৫২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের রেকর্ড করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি মৌসুমে (জুন-সেপ্টেম্বর) সর্বোচ্চ ৫,০৮০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের রেকর্ড করা হয়।[৫]

বাংলাদেশ বর্তমানে ৭ টি বিভাগ, ১০ টি সিটি কর্পোরেশন, ৪ টি মেট্রোপলিটন সিটি, ২৭৭ টি পৌরসভা, ৬৪ টি জেলা, ৪৯২ টি উপজেলা, ৪,৫০১ টি ইউনিয়ন, ৪০,৫০৯ টি ওয়ার্ড ও ৮৭,৩১০ টি গ্রাম রয়েছে।[৬]

এদেশের ৮৯.৩৫% মুসলমান, ৯.৬৪% হিন্দু, ০.৫৭% বৌদ্ধ, ০.২৭% খ্রিস্টান এবং ০.১৭% অন্যান্য ধর্মের লোক বাস করে।[৭] বাংলাদেশের ৯৮% লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পকিস্তান হতে আলাদা হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চল বৌদ্ধ, হিন্দু এবং মুসলমান দ্বারা শাসিত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ইতিহাসের আলোকে 'বঙ্গ' নামটি অনেক প্রাচীন। প্রাচীন কালের বাংলা নামের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক কে. আলী বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

> প্রাচীন যুগের 'ঐতরেয় আরণ্য' গ্রন্থে আমরা সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ লক্ষ্য করি। 'বোধায়ণ ধর্মসূত্র' গ্রন্থে এ নামের ব্যবহার রয়েছে। 'মহাভারত' 'রামায়ণ' গ্রন্থেও একাধিকবার 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ করা হয়। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেও আমরা বঙ্গ বা রাঢ় দেশের সন্ধান পাই। তবে এ সকল ধর্ম গ্রন্থে ও প্রাচীন যুগে 'বঙ্গ' বলতে যে ভূখণ্ড বুঝাত, আধুনিক কালের 'বঙ্গদেশ' তার সমার্থক নয়।[৮]

সর্বোপরি ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, তৎকালীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের সমষ্টি গত দুটি অঞ্চলের নাম ছিল 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' যা মুসলিম শাসনামলে 'বাংলা' ও 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা নামের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক আবদুল করিম বলেন–

> ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের বিভাগ-পূর্ব বাংলা, বা ইংরেজদের Bangal বা মোগলদের সুবা বঙ্গালা দ্বারা যেই ভূ-খণ্ড বুঝাইত, সেই ভূ-খণ্ডকে বুঝাইতে শুরু করে। বরনী এবং আফিফের সাক্ষ্যে পরিষ্কার হইয়া উঠে যে প্রাচীন 'বঙ্গ'-এর পরবর্তী নাম 'বঙ্গালা' । অতএব 'বঙ্গ' হইতে 'বঙ্গালা' নামের উৎপত্তি।[৯]

বাঙালি জাতিসত্ত্বার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায় বলেন–

আর্যোপনিবেশের পূর্ব্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধহয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় অরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অদিবাসী। নৃত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসীগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাম্মণাদি উচ্চ-জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্য্য জাতীয় অথবা আর্য্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বঙ্গবাসীগণকে জাতি নির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।[১০]

বাংলার সর্ব-প্রাচীন সংঘঠিত জন বসতি '*জনপদ*' নামে পরিচিত ছিল।[১১] যদিও এলাকাটির প্রাচীনত্ব ২০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সময়কাল ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে সংক্ষিপ্ত করে আনলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে মৌর্য যুগে মহাস্থান

Dhaka University Institutional Repository

গড়ের সভ্যতার অনেক আগেই বাংলার এ অঞ্চলটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করেছিল।[১২] যে রাজবংশ ও নৃপতিগণ বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করছিল তারাই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ৩২৭ খ্রিস্ট-পূর্ব অব্দে আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন বাংলাদেশ একটি পারাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।[১৩] মৌর্য সাম্রাজ্যের (৩২১-১৮৫ খ্রি. পূ.) অব্দে পূর্ব সীমান্তে ছিল পুণ্ড্র বর্ধন। একইভাবে গুপ্ত শাসনকালে বঙ্গরাজ্য প্রথম স্বাধীন রাজ্য বলে অনুমিত হয়। বৈন্যগুপ্তের (৫০৭ খ্রি.) গুনাইধর তাম্রশাসনের দূতক বিজয়সেন এবং গোপচন্দ্রের সামন্ত রাজা মহারাজা বিজয়সেন অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। এই ধারণা সঠিক হলে বলা যায়, গুপ্তবংশীয় বৈন্য গুপ্তের পর পরই অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহারাজা গোপচন্দ্র বঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৪] এ সময়কালে তারা বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বাইরে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেননি। রাজা শশাঙ্ক (আনু. ৬০০-৬৩০খ্রি.) এবং পাল রাজবংশের সময় ৭৫০-১১২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন রাজবংশ এ অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে রাজ্য শাসন করে।

অষ্টম শতকের প্রথমার্ধেই ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু অঞ্চলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিস্তার লাভ শুরু করে। মুসলমানদের ভারতীয় অঞ্চলে বিজয় লাভের ওপর আলোচনা করেতে গিয়ে সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন–

> Muslims came to India, sometimes, supremely unconcerned with worldly aims and ambitions and guided solely by the lofty sentiment of religious service .[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

শিহাব উদ্দিন ঘুরি ক্ষমতায় আসার পর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করেন। বখতিয়রি মাত্র ১৮ জন সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদীয়ায় প্রবেশ করেছিলেন।[১৬] ১২০১ মতান্তরে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে মুসলিম শাসন শুরুহয়। এ সময়কাল সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল করিম বলেন–

> খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেশে মুসলমানদের আগমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং কালে মুসলমানেরা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।[১৭]

১২০১ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর বিজয় হতে হুসাইন শাহী বংশের সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান মাহমুদ শাহ (মৃ.১৫৩৮ খ্রি.) এর সময় পর্যন্ত সুলতানি আমল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সময়কালের মধ্যে কিছুদিন হাবশি শাসন ও ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে হোসেনশাহী আমল তথা মুসলমানদের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদি বংশের সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারতে মুগল শাসনের সূচনা করেন।[১৮] ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুসাইন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বঙ্গে শুর বংশীয় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশ হতেই সম্রাট বাবর ও তার সন্তান হুমায়ুন ভারতের মসনদে আসীন হন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন শের খান সূরকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শের খান সূর দিল্লিগামী সম্রাট হুমায়ুনকে আক্রমণ করে পরাজিত করে পূণরায় বাংলা দখল করেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুগল সম্রাট আকবর বঙ্গ জয় করলে চূড়ান্তভাবে বঙ্গীয় অঞ্চল মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে র‍্যালফ ফীচ ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ পর্যটন করেন। তাঁর উৎসাহ এবং পর্তুগীজদের সাফল্য ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলেছিল।[১৯] এরই প্রেক্ষাপটে ইংরেজগণ ক্রমান্বয়ে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাণী

Dhaka University Institutional Repository

এলিজাবেথের নিকট হতে একটি অনুরোধ পত্র নিয়ে সম্রাট আকবরের দরবারে আসেন। পরবর্তীতে ইংরেজগণ 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রাচ্য দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়। ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গির সুরাটে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন।[২০] ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ পিপলিতে একটি সমুদ্র বন্দরসহ বাংলায় কারখানা স্থাপনের জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে।[২১] ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে সুবাদার মুর্শিদকুলি খান স্বাধীনভাবে বাংলা অঞ্চল শাসন করেন। তিনি ইংরেজগণকে শুল্ক প্রদান করে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেও তাদের কোনো দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেননি। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। এ সুযোগে ইংরেজগণ তাদের বাংলাদেশে অবস্থিত ঘাঁটিগুলোতে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। নবাব ক্ষিপ্ত হয়ে শওকত জঙ্গকে কলকাতায় অভিযান প্রেরণ করলে শওকত জঙ্গ সফল হলেও ইংরেজরা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রবার্ট ক্লাইভ এবং ওয়াটসন কলকাতার কুঠি ও দুর্গগুলো পুনঃদখল করতে সমর্থ হয়। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মীরজাফরের আশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশেষে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথি নদীর তীরে পলাশির প্রান্তরে উভয় পক্ষ যুদ্ধে উপনীত হন। উক্ত যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই পলাশি প্রান্তরে বাংলার স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশগণ এ অঞ্চলে প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হওয়ার ইতিহাস ও ইংরেজদের কর্তৃত্ব গ্রহণের আলোচনায় শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন–

> সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া নবাব হইবার জন্য মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে গোপনে যে সন্ধি করেন তাহার একটি শর্ত ছিল এই যে, সুবে বাংলাকে ফরাসি ও অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্তে ইংরেজ কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিবে। এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে। মীর

Dhaka University Institutional Repository

> কাশিম ইংরেজদের সাথে যে, গোপন সন্ধির দ্বারা মীরজাফরকে সরাইয়া নিজে নবাব হইলেন তাহার শর্ত অনুসারে তিনি ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলার রাজস্ব কোম্পানীকে দিলেন। ইহার পর মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ বাধিলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হইবার জন্য ইংরেজদের সহিত যে সন্ধি করিলেন তাহার শর্ত অনুসারে ইংরেজ কোম্পানী ঐ তিনটি জিলা হস্তগত করিল এবং স্থীর হইল যে, বাংলার নবাব বারো হাজার অশ্বারোহী ও বারো হাজার পদাতিকের বেশী সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। ইহার ফলে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি ইংরেজদের হাতেই ন্যস্ত হইল।[২২]

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস কে কলকতার গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ভারতের কোম্পানির ভিত্তি সুদৃঢ় করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান।[২৩] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সর্ব প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংল্যান্ডের জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। সে অনুসারেই ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।[২৪] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন কার্যকরী হওয়ার সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১লা নভেম্বর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তান নাম ধারণ করে বাংলাদেশ অঞ্চল পাকিস্তানের সাথে স্বাধীনতা লাভ করে।

ব্রিটিশদের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ণতা লাভের পূর্বেই ভাষা সংক্রান্ত জটিলতার সূত্রপাত হয়। এবং বাংলাকে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের জোর দাবি ওঠে। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পেছনে ছিল ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা, অধিকন্তু প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাস্ট্রে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে চেতনা। এ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া সংগঠনগুলোর পরিচয় দিতে গিয়ে শিরিন হাসান ওসমানি বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

> In June 1949 the Awami Muslim League was formed. The Nizam-i-Islam was founded in 1950 and the Krishak Sramik Party (KSP) in 1953. The same year the Gonatantri Dal was formed. With the formation of these political parties the politicians joined hands with the students in their struggle to make Bangla one of the state languages of Pakistan. Among the student organizations the East Pakistan Muslim Students League (EPMSL) was formed by the students on june 1948. On March 27 1951 the youth League was founded. The formation of these two student organizations was a turning point in the language movement.[25]

পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় এক শতাব্দী আগে বাংলা ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তার ফলে সৃষ্ট উনিশ শতকের মানবতাবাদী আন্দোলন এবং বিশ শতকের শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রবর্তিত আংশিক গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞতা বাঙালি জনগোষ্ঠির মধ্যে ভালভাবেই শিকড় গেড়েছিল।[২৬] ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত-পাকিস্তানের জনগণ যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল তার মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ।[২৭] ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত বছরগুলোতে সংঘঠিত ভাষা আন্দোলন থেকে উন্মেষ ঘটে ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভূ-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আওয়ামি লীগ, বিভিন্ন প্রগতিশীল দল ও সংগঠন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারার প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান।[২৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় জনসংখ্যার কোন সঠিক হিসাব নির্ণীত হয়নি, কিন্তু বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল অভ্রান্ত, উর্দু পাকিস্তানের বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ছিলনা এবং পাকিস্তানের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মাঝে বাংলাভাষাই ছিল সর্বাপেক্ষা উন্নত।[২৯] এ সকল সমস্যাকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন গণপরিষদে ব্যবহার্য ভাষা রূপে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব করেন তখন সে প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমেই তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দানের দাবি করেন।[৩০] কারণ পাকিস্তানের মোট

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০ ভাগ মানুষ ছিল বাংলা ভাষী, অপরপক্ষে শতকরা ৩০.২৭ ভাগ ছিল উর্দু ভাষী।[৩১] খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোনো ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। নিম্নে সারণির মাধ্যমে পাকিস্তানের ভাষাগত জনগোষ্ঠির একটি হিসাব উপস্থাপন করা হলো-

সারণি ২.৬

পাকিস্তানের উভয় অংশে ভাষিক চিত্র

ভাষা	পূর্ব	পশ্চিম	মোট
বাংলা	৯৮.৪২%	০.১২%	৫৬%
উর্দু	০.০২%	৬৬.৩৯%	২৯%
পাঞ্জাবি	০.৬১%	৭০৫৭%	৩.৬৫%

সূত্রঃ *Pakistan Statistical Year Book,* 1969.[32]

বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়-প্রধানত এই হীন মনোবৃত্তি ও যুক্তি থেকে বৈরিতার সূত্রপাত ঘটে।[৩৩] পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন।[৩৪] এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের রাত হতে ক্রমাগত ১ মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঐ দিনই কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে আবুল হাশিমের (১৯২৫-১৯৭৪ সাল) সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' এক জরুরী সভা আহ্বান করা হয়।[৩৫] উক্ত সভায় ব্যাপক আলোচনা করে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ করে নিবৃত করতে না পেরে উক্ত মিছিলের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত (রাষ্ট্র বিজ্ঞান, এম এ শ্রেণির ছাত্র) নিহত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যায়।[৩৬] ভাষা আন্দোলনের গভীরে প্রোথিত ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের আর্থ সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা।[৩৭] ১৯৫২ সালের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসটিকে 'শহিদ দিবস' হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে আসছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।[৩৮]

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিশাল জয়কে পাকিস্তানিরা মেনে নিতে পারেনি। নির্বাচন পরবর্তী ৩ এপ্রিল এ কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন। বস্তুত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেশীয় এলিটদের কাছে জাতীয় এলিটগণ পরাজিত হয়।[৩৯] কিন্তু দুই মাস অতিবাহিত না হতেই গভর্ণর জেনারেল দেশে সংবিধান না থাকার সুযোগে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অধীনে লব্ধ ক্ষমতাবলে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে এ কে ফজলুল হকের প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করেন।[৪০]

আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। এতে করে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর পাঞ্জাবিদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শাসন-শোষণ কায়েম হয়। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তনের পূর্ণ-স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন।[৪১] ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামক একটি রাস্ট্রদ্রোহী মিথ্যা মামলা রুজু করে। এ মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ[৪২] কয়েকজনকে আটক করা হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- আজকের লড়াই বাইশ পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই। ২২ বছরে তারা দেশের সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করেছে।[৪৩] ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪৪] উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[৪৫] আর পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮ টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) ৮৩ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।[৪৬] ভুট্টো ক্ষমতা হস্তান্তরে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তাদের এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের সর্বস্তরের জনগণ রাস্তায় নেমে আসেন। ১৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং বাংলার মেহনতি জনতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের শাসনভার পরিচালনার জন্য ৩৫ টি নির্দেশও জারি করেন।[৪৭] ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করে। সেই ভয়াল কালো রাতে বাংলার নিরস্ত্র মানুষের উপর পাকিস্তানি হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা চালায়। রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন যে, গণপরিষদ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে। এই অধিবেশেনে গণপরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আঃ হামিদ।[৪৮] অতপর ড. কামাল হোসেনকে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ঘোষণা করে ৩৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার সমৃদ্ধ সংবিধানের একটি খসড়া বিল এ কমিটি প্রস্তুত করে-যা ঐ বছরের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে উত্থাপন ও সংশোধনীর জন্য পাশ করা হয়। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান শাখা হলো সংসদ, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য ৩০০ আসনে সদস্য নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও ৫০ টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের ভোট প্রদানের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। রাষ্ট্রপতি এদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। জাতীয় সংসদের সকল সদস্যের ভোটে প্রতি ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হয়ে থাকেন। সাংবিধানিকভাবেই তার ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে। তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই সিদ্ধান্ত নিতে সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সংসদের সদস্য হতে হয়। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ করে দায়িত্ব লাভ করেন।

বাংলাদেশের প্রশাসনের নির্বাহী ক্ষমতার বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় রয়েছে। নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান বা সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন একজন সচিব। প্রতিটি জেলা উপজেলায় সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর দুটি স্তর রয়েছে একটি হল আপীল বিভাগ অপরটি হাইকোর্ট বিভাগ। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনা হয়। উক্ত সংশোধনীর ফলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রবর্তন করা হয়। উক্ত বছরের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয় সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এ হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক উপায়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আরেকটি পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটান। ৫ই নভেম্বর খালেদ মোশাররফ খন্দকার মোশতাককে বিচারপতি সায়েমের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর কর্ণেল তাহের এবং হাসানুল হক ইনু'র নেতৃত্বে আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটে। এ অভ্যুত্থানে বন্দি জিয়াউর রহমানকে [৫০] মুক্ত করে তাকে পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বিচারপতি আবু সাদত মোঃ সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন।

১৯৭৭ সালের ২৩ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করে ৩০ মে গণভোটের ব্যবস্থা করেন। উক্ত নির্বাচনে ৯৯% ভোট পেয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সংঘটিত এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন।[৫১] জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে বিচারপতি আবদুস সাত্তার এক ঘোষণার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রধান এ এইচ এম এরশাদের নিকট দেশের শাসনভার অর্পণ করে পদত্যাগ করেন। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই জনগণের ওপর নিজস্ব শাসন কায়েম করা শুরু করে। দিন দিন তার অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ১৯৮৩ সালে এদেশের ছাত্র জনতা সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৮৩ সালে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মেজর রফিকুল ইসলাম বলেন–

> ১৯৮৩'র মধ্য ফেব্রুয়ারিতে প্রায় আকস্মিকভাবে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং নেপথ্যের রাজনৈতিক বিক্ষোভ সামনে চলে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি চললো, রাজনৈতিক নেতাদের চোখ বেধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সি.এম.এল এ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

> দায়িত্ব গ্রহণের বর্ষপূর্তির লগ্নে ভবিষ্যত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর জাতীয় পর্যায়ে সংলাপ হবে। আমরা এমন এক ব্যবস্থা চাই যেখানে সরকার পরিবর্তনে গুপ্তহত্যা কিংবা রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রয়োজন হবেনা। ২৬ মার্চ ঘোষণা দিলেন ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়ো রাজনীতি। রাজনীতির অঙ্গনে নড়াচড়া শুরু হল। পাশাপাশি সরকার সমর্থকদের একত্রিত করার কাজেরও সূচনা ঘটল।[৫২]

১৯৮৫ সালের ১ মার্চ সামরিক আইন জারি করে। এরশাদের শাসন নীতি ও কর্মসূচি এবং স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে তার বহাল থাকা প্রশ্নে আস্থা আছে কিনা সে বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করা হয়। এ প্রহসনমূলক গণভোটে ৯৪.১৪% হাঁ ভোট পেয়ে এরশাদ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন।

১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পুনরায় আন্দোলন অনেক শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ১০ নভেম্বর হতে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিভিন্ন কর্মসূচিতে রাজপথ দখল করে নেয়। ২৭ নভেম্বরে ছাত্রদলের বহিষ্কৃত ছাত্র নীরু-অভি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের অভিযান অব্যাহত থাকে। দোয়েল চত্বর থেকে বাংলা একাডেমি পর্যন্ত জায়গা অস্ত্রধারীরা দখল করে রাখে। এই সময় এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কয়েকজন নেতা মেডিকেল কলেজের দিকে আসছিলেন। আকস্মাৎ তাদের দিকে গুলি ছুড়ে সন্ত্রাসীরা। বি.এম.এ'র যুগ্ম সম্পাদক ডা. শামসুল আলম খান মিলন এই গুলিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[৫৩] ডা. মিলনের মৃত্যুর খবরে পুরো ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে মিছিল সমাবেশ ঘঠে যা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এ দিনের আন্দোলনের ওপর মেজর রফিকুল ইসলাম বলেন–

> আইন মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিবের ওপর দায়িত্ব ছিল এসব তৈরী করার। এসব আদেশ এরশাদের স্বাক্ষর কারার পরই ঘোষণা করার কথা। পুরানো সংসদ ভবনে মিনি কেবিনেট এবং এরশাদ এগুলো পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র-জনতার

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষোভের ফলে ঐ সব কাগজ পত্র রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে পৌছানো যাচ্ছিলনা। এ দিকে বিকেল চারটার দিকে রেডিও টেলিভিশনকে এরশাদের ভাষণ ধারণ করার জন্য ডাকা হয়। এরশাদের ভাষণ দানের কথা এরপর আর গোপন থাকেনি। পরদিন হরতাল হতে পারে, সরকার কি করতে যাচ্ছে এই রকম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সর্বস্তরের জনসাধারণ তাদের মত প্রকাশ করে দেন বিভিন্ন মিছিলের মাধ্যমে। চারদিকে শুধু মিছিল আর মিছিল। এ দিকে মিনি কেবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় প্রথমে সান্ধ্য আইন জারি করে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে জরুরি আইন জারি করা হবে।[৫৪]

১ ডিসেম্বর পুরো রাজধানী বিক্ষোভ মিছিলে জনসমুদ্র হয়ে ওঠে এবং ৮ দলীয়, ৭ দলীয় ও ৫ দলীয় জোট ১২টি নির্দেশনা সংবলিত যৌথ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে গণবিক্ষোভের বিস্তার ও তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। ২ ডিসেম্বর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীতে ছাত্রদের ভ্রাম্যমাণ আদালত বসে। এখানে বিচার শেষে জেনারেল এরশাদকে ফাঁসি দেয়া হয়। এরশাদের কুশপুত্তলিকা গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি কার্যকর করা হয়।[৫৫] ৩ ডিসেম্বর এরশাদ একই তারিখে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা দিয়ে টিভি এবং বেতারে ভাষণ দান করেন। কিন্তু কোনো কিছুই এরশাদকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে জনতার দাবি মেনে নিয়ে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইরানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিশ্ব মানচিত্রে ইরান একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানের পাহলভি বংশের দ্বিতীয় সম্রাট মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভির বিরুদ্ধে জনসাধারণের গণ-আন্দোলনের ফলে সংঘঠিত হয় ইসলামি বিপ্লব। জনগণের এ বিজয়ের মাধ্যমে ইরানে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রের' অভ্যুদয় ঘটে। প্রায় আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের সমাধি ঘটিয়ে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইরানের বুকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়।

ইরান শব্দের অর্থ আর্য। আর্যরা ইউরোপ থেকে এই এলাকায় এসে বসবাস শুরু করে তাই এই এলাকার নাম ইরান রাখা হয়।[৫৬] ইরানের প্রাচীন নাম হলো ফারস বা পারস্য। এ শব্দটির উৎপত্তি হলো জরথুস্ট্রিদেয় ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা' হতে। হোশাঙ্গ ইবন কিউমারস তার রাষ্ট্রের নাম রাখেন ইরান, আর তদীয় পুত্র পারেস যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন একে মুলক-ই-পারেস বলা হতে থাকে।[৫৭] পরবর্তীতে 'ইরান' নামকরণ হলেও এ শব্দটিও আবেস্তা হতে নেয়া হয়েছে। ইরানের নামকরণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে E.G Browne বলেন–

> '*Iran, Eran, Airan*, the *airiyana* of the *Avesta*, is the land of the Aryans (Ariya, Airiya of the Avesta, Sanskrit Arya), and had therefore a wider signification than the term of Persia, which is equivalent to *Iran* in the modern sense, has now. [৫৮]

এম এ কাউসার ইরানের নামকরণের ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন– ১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের মানচিত্রে ইরান পারস্য নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩৫ সালে ইরানের শাসক রেজা শাহ পাহলভি দেশের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন ইরান। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর দেশটির সরকারি নাম হয় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

সাসানি যুগে জরথুস্ট্র ছিলো ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এ সময় অন্য কোনো ধর্মের চর্চা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম শাপুর-এর শাসনামলে (শা ২৪২-২৭৩ খ্রি.) ইহুদি ও খ্রিস্টানধর্মসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ইরানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ভারত থেকে আগত বৌদ্ধধর্ম ইরানে পর্যায়ক্রমে প্রসার লাভ করে। জরথুস্ট্র, খ্রিস্ট্র ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্ভাব্য ত্রিমুখী সংঘর্ষের হাত থেকে ইরানকে রক্ষা করতে ত্রাণকর্তা রূপে ইসলামের আগমন ঘটে। ইরানে ইসলামের আগমণের পরে ক্রমান্বয়ে তা দুটি বিশ্বাসে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মতাদর্শ এবং অপরটি শিয়া মতাদর্শ নামে প্রসিদ্ধ। সাফাভী যুগের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ইরানে শিয়া মতাদর্শ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে পরিণত হয়। ১৯৭১ সাল পরবর্তী সময়ে ইরানে সংখ্যাগুরু শিয়া মতাদর্শের অনুসারীগণ বসবাস করত, তাই এখানে শিয়া মতাদর্শ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

শিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ দল, অনুসারী, সমর্থক ও সাহায্যকারী। শিয়া বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি হযরত আলী (রা.) ও আহলে বাইত-এর সমর্থক, ইমামত আকীদায় বিশ্বাসী এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর চেয়ে হযরত আলী (রা.)-এর অধিক মর্তবা থাকার প্রবক্তা। বর্তমানে সাধারণত শিয়া বলতে ইসনা আসারিয়া বা ইমামিয়া শিয়াদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে। ইসনা আসারিয়া বা ইমামিয়া শিয়ারা নিজেদেরকে বৈধতাবাদী দল মনে করে। অন্যরা চরমপন্থী বা বিচ্ছিন্ন দল।[৬০] ইয়াহিয়া আরমাযানি বলেন-

> যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইসলামকে স্থায়ী ভাবে ২টি দলে বিভক্ত করিয়া ফেলে তাহা হইলো শীয়া মতবাদ। শীয়া সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ছিলো একটি রাজনৈতিক দল। ইহা ইসলামের রহস্যবাদ, যাজকতন্ত্র, প্রায়শ্চিত্ত্যতন্ত্র, বর্ণবাদ ইত্যাদির আমদানি করে, যেগুলির অধিকাংশ সুন্নীরা বর্জন করিয়াছে। সুন্নীগণ কোরানকে দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে, অথচ শীয়াগণ দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে মানুষকে।[৬১]

অধিকাংশ শীয়া বিশ্বাস করে যে, ইমাম ১২ জন ছিলেন এবং ইহাও বিশ্বাস করে যে দ্বাদশ ইমাম, মাহদী (মাশীয়াহ) লূক্কায়িত রয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় আগমন

Dhaka University Institutional Repository

করে সমস্ত পৃথিবীকে শীয়া ইসলামের আওতাভুক্ত করবেন। নিম্নে বার জন ইমামের নাম দেওয়া হলো-

১। আলী (মৃঃ ৬৬১)

২। হাসান (মৃঃ ৬৬৯) — ৩। হোসাইন (মৃঃ ৬৮০)

৪। আলী জয়নাল আবেদীন (মৃঃ ৭১২)

জায়েদ — ৫। মুহম্মদ আল-বাকের (মৃঃ ৪৩১)

৬। জাফর আস সাদেক (মৃঃ ৭৩১)

ইসমাইল (মৃঃ ৭৬০) — ৭। মূসা আল কাজেম (মৃঃ ৭৯৯)

৮। আলী আর রিজা (মৃঃ ৮১৮)

৯। মুহম্মদ আল জাওয়াদ (মৃঃ ৮৩৫)

১০। আলী আল হাদী (মৃঃ ৮৬৮)

১১। হাসান আল আসকারী (মৃঃ ৮৭৪)

১২। মুহম্মদ আল-মুনতাজার (মাহদী (মৃঃ ৮৭৮)।[৬২]

ইরানের আয়তন প্রায় ১৬,৪৮,১৯৫ বর্গ কিলোমিটার। এটি পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম একটি দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ হিসেবে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে ও পারস্য উপসাগরের উত্তরে ইরান অবস্থিত। মধ্যপ্রাচ্যে ১৭ টি দেশ অবস্থিত এ দেশগুলো হল বাহরাইন, সাইপ্রাস. মিসর, ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়ামেন।[৬৩] বর্তমান ইরান ২৫ টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত।

প্রাচীন ইরানের ভূখন্ড দজলা (Tigris) থেকে সিন্ধু উপত্যকা এবং কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস থেকে আরব মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও পারস্য এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের একটি অংশ (প্রদেশ) মাত্র। এ অংশের প্রভাব সমগ্র ইরানকেই প্রভাবিত করেছে।[৬৪] ইরানের সাথে পাকিস্তানের ৮৩০ কিলোমিটার, আফগানিস্তানের সাথে ৮৫০ কিলেমিটার, তুরস্কের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

৪৭০ কিলোমিটার, ইরাকের সাথে ১২৮০ কিলোমিটার এবং সিরিয়ার সাথে ১৭৪০ কিলোমিটার সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে।[৬৫] এছাড়া উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, ওমান সাগর ও পারস্য উপসাগর এবং অন্যান্য সীমান্ত মিলে সর্বমোট ৭৪৮০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ইরানের সবচেয়ে উচু পর্বত শৃঙ্গের পরিচয়ে বলা হয়েছে-

> Physically, Iran consists of a complex of mountain chains enclosing a series of interior basis that lie at attitudes of 1000 to 4000 ft above sea level. These mountin ranges rise steply from sea-level on the north and the south.[66]

তেহরানের দামভান্দ-এর উচ্চতা ১৮,৬০৩ ফুট। উত্তর ইরানে আলবুর্জ পর্বতমালা এবং প্রায় ৮০০ মাইল দীর্ঘ মরুভুমি রয়েছে। ওমান সাগর ও পারস্য উপসাগরের সংযোগস্থলে রয়েছে ঐতিহাসিক হরমুজ প্রণালি।

ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান ৩৯°৪৭ ও ২৫°৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৪৩°১৮ ও ২৪°৫ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত ।[৬৭]

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইরানের আবহাওয়ায় মিশ্রতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণে পারস্য উপসাগর উত্তরে পাহাড়রাজি এবং মরুভুমির প্রভাবে উষ্ণতা, শীত ও বৃষ্টি প্রবণ এলাকা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও শীতকালে ইরানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে তুষারপাত ঘটে।

২০১১ সালে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী ইরানের মোট লোক সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৬৯ জন ।[৬৮] বর্তমান ইরানে ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৪২ জন মুসলিম, ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৭০৪ জন খ্রিস্টান, ৮ হাজার ৭৫৬ জন ইহুদি, ২৫ হাজার ২৭১ জন জরথুস্ট্রিয়ান এবং ৪৯ হাজার ১০১ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাস করে। এছাড়া ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৯৫ জন লোকের কোনো ধর্ম পরিচয় পাওয়া যায়নি।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

ইরান মুলত তেল ও গ্যাস নির্ভর অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইরানের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান হল তেল। ইরানের তেল সম্পদের একটি আলোচনায় Roger Howard বলেন–

> Iran's strategic location could also allow the huge oil reservers of its landlocked northern caspian neighbours to be transported either further south, towards the southern ports at Irans Kharg Island terminal in the Persian gulf, or westword into Iraq's existing infrastructure.[৭০]

এছাড়াও বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় গ্যাসের মজুদ রয়েছে ইরানে। দেশটির গ্যাস মজুদের ব্যাপারে Roger Howard বলেন–

> Besides oil, Iran is also believed to own the second largest reserve of natural gas in the world, a reserve thought to amount to around 20,000 billion cubic meters, much of it concentreted in the massive offshore south Pars field in the Persian Gulf.[৭১]

ইসলামি বিপ্লবের পর পশ্চিমা বিশ্ব ও আমেরিকার শূন্য দৃষ্টির কারণে ইরান তেল নির্ভর অর্থনীতি থেকে পিছু হটে কৃষি ও শিল্পায়নের প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করছে। তদুপরি রাশিয়া, ভারত ও চীনের সাথে ব্যাপক ভিত্তিক তেল ও গ্যাস বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

ইরানের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধশালী। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ইরানে মানব সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। হাসান আল চৌধুরী বলেন-

> খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ইরানে আর্যদের আগমণ ঘটে। আর্যদের দলটি দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল ইরানে "মিডিয়া" (Media) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এলাকার সাথে সম্বন্ধ করে তাদের 'মাদ' বলা হয়। অপর দলটি ইরান অতিক্রম করে দক্ষিণ ইরানের 'পারস' এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এই এলাকার সাথে সম্বন্ধ করে তাদেরকে 'আহলে পারস'বা 'পারসি' বলা হয়। বাংলায় এই 'পারস'কে 'পারস্য' বলা হয়।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

এদের দুটি শাখা থেকে একটি শাখা পারস্যের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিকশিত হয় পারসিক নামে। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে পারসিক দলপতি আকামেনিস (□□□□□□□) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তার নামানুসারে আকামেনীয় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। এ জাতিগোষ্ঠী ৫৫৯-৫৩০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে পারসিক অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে কোরেশে আজম সাইরাস-২ নামক সম্রাট ৫৫৯ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে পারসিকদের শাসন করে। সাইরাস-২ এর শাসনকালে তিনি ৫৩৯ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ব্যবিলন এবং মেসোপটেমিয়াসহ আর্যদের দুটি শাখায় তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তিনি ছিলেন হাখামানশি বাদশা কনবুজিয়ার পুত্র এবং চয়েশ পীশের পৌত্র। তার প্রোপিতামহ হাখামানশ-এর নামানুসারে এই রাজবংশের নামাকরণ করা হয় হাখামানশি।[৭৩] ৫৩০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র কেম্বিসেস ২য় ক্ষমতায় আরোহন করে।

দারিউস (৫২২-৪৮৬ খ্রি.পূ.) এর শাসন কালে সাইরাস এবং কেম্বিসেস এর বিজিত অঞ্চলসমূহ একত্রিত করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ৫০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে দারিউস পারস্য শাসনকালে তিনি পারস্যের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করেন। তার বংশধর দারিউস ৩য়'র শাসনকাল গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের পারস্য জয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আলেজান্ডার দ্যা গ্রেট ৩৩৪ পূর্বাব্দে অভিযান চালিয়ে ৩৩১ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে পারস্য জয় করেন খ্রিস্ট-পূর্ব ১৫০ অব্দ পর্যন্ত গ্রিকরা পারস্য সাম্রাজ্য শাসন করে।

২৪৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে পার্থিয়ান নামক একটি রাজবংশের উত্থান ঘটে। আরশাক পারতু বা পারথিয়ানদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, তাকে সংক্ষেপে আশকও বলা হত। পার্থিয়ানরাই গ্রীকের সাথে যুদ্ধ করে ১৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে পুরো পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে। যা আশকানী যুগ (২৪৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ-২২৬ খ্রি.) নামে খ্যাতি লাভ করে। পার্থিয়ানদের □□□□□ করে ২২৬ খ্রিস্টাব্দে সাসানি রাজবংশ পারস্য অধিকার করে এবং ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন

Dhaka University Institutional Repository

করে। ২০৮ খ্রিস্টাব্দে সাসানি সম্রাট উরদেশীর পারসেপলীস (শিরাজ) নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

৬৫০ খ্রিস্টাব্দে আরবদের বিজয়ের পর থেকে পারস্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস সাসানি রাজবংশের রাজধানী মা'দাইন (টেসিফোন) দখল করার পর থেকে পারস্যে মুসলিম প্রভাব, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের সময়কালে পারস্য মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিদের পারস্য জয় পর্যন্ত বেশ কিছু রাজবংশ ইরান শাসন করে। তুর্কিরা ১০৩৭-১২১৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্য শাসন করার পর ১২১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে মোঙ্গলরা পারস্য শাসন করে। চেঙ্গিস খানের[৭৪] নেতৃত্বে মোঙ্গলদের এই উত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ করে মুসলিম ইতিহাসে এক হৃদয়বিদারক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৭৫] এ সময় চেঙ্গিস খানের রাজ্য খাওয়ারিজম শাহের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরী হয়।[৭৬] মোঙ্গল সম্রাট হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস ও পারস্যে আধিপত্য বিস্তারের ফলে ইলখানি বংশের সুলতানগণ ১২৫৮-১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্যে রাজত্ব করেন। ইলখানি বংশ পতনের পর চাকতাই বংশের নৃপতি তৈমুর লং এর নেতৃত্বে পুরো পারস্য সাম্রাজ্য পরিচালিত হতে থাকে। এ বংশটি ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য শাসন করে। চাকতাই বংশের শাসন পরবর্তীসময়ে পারস্যে সম্রাট শাহ ইসমাইলের নেতৃত্বে সাফাভি বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাফাভি রাজবংশ পারস্য শাসন করে। সাফাভি রাজবংশের উক্ত ২০০ বছরের শাসন কালে প্রায় ১৪জন সম্রাট ক্ষমতাসীন হন। সাফাভি বংশের পতনের পর কিছুদিন যাবত পারস্য সাম্রাজ্য আফগানরা শাসন করে। ১৭৩৬ থেকে ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাদির শাহ রাজত্ব করেন।[৭৭]

১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে আফসারি ও জান্দ বংশ পারস্য সাম্রাজ্যে রাজত্ব করে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কাজার বংশের শাসন শুরু হলেও ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে আগা মোহাম্মদ খান ক্ষমতা গ্রহণের পর এটি শক্তিশালী রাজবংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আগা মোহাম্মদ খান

Dhaka University Institutional Repository

এর শাসনামলে ইরান অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভীতের ওপর অবস্থান করে। আগা খান এর মৃত্যুর পর তার ভাতিজা ফতেহ আলী ক্ষমতা আরোহণ করেন। মুলত কাজার বংশের শাসনকাল হতেই ইরান ইউরোপের সাথে ব্যাপক ভিত্তিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। যার ফলে রাশিয়া কর্তৃক ইরানের দখলিয় ভূমি পুনরোদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন–

> ফতেহ আলীর রাজত্বকালে ইরানে ফরাসি ও ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। একদিকে নেপোলিয়ন দূত প্রেরণ এবং ইরানের সাথে সন্ধি স্থাপন করে রাশিয়ার দখল থেকে ইরানের ককেশাস অঞ্চল উদ্ধারের প্রস্তাব দেন, অন্যদিকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ইরানের সাথে সখ্য স্থাপন করে প্রাচ্য ও ভারত উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ প্রভাব ও আধিপত্য হ্রাসের প্রয়াস পায়। ইরানের ক্রমবর্ধমান ফরাসি প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল ক্যাপটেন ম্যালকমকে ইরানের শাহের দরবারে পাঠান। ফতেহ আলী শাহের সঙ্গে ম্যলকম একটি চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন।[৭৮]

এভাবেই রাশিয়া, ব্রিটিশ ও ফ্রান্স ত্রিমুখি সম্পর্ক ও বিরোধপূর্ণ শক্তির সাথে কাজার সম্রাটগণ পারস্যকে সুরক্ষিত রেখে রাজ্য পরিচালনা করেন। প্রায় ১৩০ বছর শাসনের শেষ প্রান্তে শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বিদেশিদের তোষামোদ নীতির কারণে কাজার বংশের সর্বশেষ সম্রাট আহমদ শাহ প্রতিষ্ঠিত কশাক ব্রিগেডের এক সেনাপতি বিদ্রোহ করেন। 'তেহরান মার্চ' নামক উক্ত বিদ্রোহে সেনাপতি রেজা খানের নেতৃত্বে কাযভীন হতে তেহরান অভিযান করে। উক্ত বিদ্রোহের ফলেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি রেজা খান ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে প্রথমে যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ক্ষমতা গ্রহণের উপর আলোচনা করেতে গিয়ে এ বি এম হোসেন বলেন–

> ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি রেযা খান তার ব্রিগেডের ৩০০০ সৈন্য নিয়ে তেহরান দখল করে, এবং কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার করে সাঈদ যিয়া তাবাতাবাই নামক একজন সিভিলিয়ান সংস্কারবাদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করার প্রস্তাব দেয়। রাজা আহমেদ শাহ সম্মতি

Dhaka University Institutional Repository

জানায়, এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সাথে রেযা খানকেও সেনা প্রধান নিযুক্ত করে। সেনা প্রধান নিযুক্ত হয়ে রেযা খান সেনাবাহিনীর বর্ধিতায়ন এবং আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন গোত্রীয় সম্প্রদায়কে বশে আনয়ন করে রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনয়নে সক্ষম হয়।[৭৯]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল শাহ উপাধি নিয়ে রেযা শাহ পাহলভি নাম ধারণ করে পাহলভি বংশকে রাজবংশ ঘোষণাপূর্বক এ বংশের প্রথম শাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রেযা খান পাহলভি শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন। শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও কঠোরনীতির কারণে তিনি সফল শাহ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেন ও রাশিয়া ইরানি ভূখণ্ডের কিয়দংশ দখল করলে রেযা খান উক্ত দুদেশের চাপে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে তার পুত্র মোহাম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসিত হন। সেখানে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৮০]

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে মোহাম্মদ রেজা শাহ ক্ষমতারোহণ করেন।[৮১] ২য় বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের অস্থিতিশীলতা, রাশিয়া-ব্রিটেনের ইরান দখল, বিপর্যস্ত সেনাবাহিনী ও তার পিতার বিরুদ্ধাচরণকারী আলেম সমাজ সর্বোপরি তার দেশ চালনার অনভিজ্ঞতা তাকে অসহায় করে তোলে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ড. মোসাদ্দেক রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে ইরানি জনগণকে সচেতন করে তোলেন। তার নিয়ন্ত্রিত ন্যশনাল ফ্রন্ট ইরানি মজলিসে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাংলো-ইরানি' ব্রিটিশ তেল কোম্পানির বিরোধিতাপূর্বক চুক্তি বাতিল করে। মজলিসের উক্ত অধিবেশনেই তেল সম্পদকে জাতীয়করণ করে এবং ড. মোসাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে। ড. মোসাদ্দেক নিজেকে জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ব্রিটিশদের সাথে তেল সম্পদ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বন্দ্বের কারণে মোসাদ্দেক বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেন নি। তার পতনের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে এস এম ইমাম উদ্দিন বলেন–

> Dissagreement with the British Government reached such an extent that Musaddiq closed down all the British consulate in Persia. At home, Musaddiq picked up quarrel with the senate, the *Majlis* and the Shah. In August 1953 he tried to maintain himself in power politically by curbing the Shah's authority and dissolving the national Assembly. He brought about the dissolution of the senate by getting the period of office of the senetors reduced from six years to two. Her dissolved the *Majlis* by holding a plebiscite though not privided for in the constitution. Politically the country was in turmoil and economically it was crippled.[82]

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে এক সেনা বিদ্রোহের মাধ্যমে মোসাদ্দেক কে অপসারণ করে বন্দি করা হয়। মোহাম্মদ রেজা শাহ রোম থেকে ফিরে জেনারেল ফযলুল্লাহ জাহেদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দিয়ে দেশ পরিচালনা শুরু করেন।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পর শাহ আধুনিক ইরান গঠনের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পিত উন্নয়ন কাজের অগ্রগতিতে ইরান ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। একজন সফল শাসক হিসেবে বিশ্বে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকান ইতহিাসবিদ Donald N. Wilber, *Iran Past Present* গ্রন্থে বলেন–

> In 1976 Muhammad Reza Shah Pahlavi was very much in command of his nation. Rulling, rather than reigning, the Shah continued to initiate proposals in social and economic fields, and to insist that Iran was talking 'more decisive steps each day toward welfare, progress, glory, and greatness that the country was moving toward a great golden civilization, a 'great and new society... which would not be a permissive society or a lazy one.' And he stated that by 1983 per capita income would approach that of the most advanced European countries.[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে শাহ রাজকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইরানের রাজতন্ত্রের আড়াই হাজার বছর উদযাপন করেন। ইরানের রাজতন্ত্রে ২৫০০ বছরের ইতিহাস আলাচনা করতে গিয়ে শাহ নিজেই বলেন–

> Already I have mentioned that our monarchy has reached some 2500 years of age. I do not intend this to be an exact figure, because it depends upon how you do your Arithmatic. Cyrus the Great became king about 2506 years ago, but it took him a few years to unify the country and to consolidated our first empire.[84]

নিজের সিংহাসন রক্ষা এবং ইরানের জনগণের উন্নয়নের জন্য রেজা শাহ পাহলবি শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামরিক খাতে সফলতা লাভ করলেও সিআইএ, আমেরিকা এবং ইসরাইলের প্রতি শাহের দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ জনগণ সহ্য করতে পারেনি। অধিকন্তু আলেম সমাজের ওপর নিপীড়ন, অর্থনৈতিক দৈন্যতা এবং শাভাক বাহিনীর অত্যাচার শাহের জনসমর্থন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে দেয়। জনগণ ও আলেম সমাজের শাহ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয় ইসলামি বিপ্লব। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি শাহের দেশ ত্যাগের মাধ্যমে পাহলভি রাজবংশ তথা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ইমাম খোমেইনী (রহ.)[৮৫]- এর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ বিপ্লবের মাধ্যমেই ইরান 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান' নামে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখছে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর রাষ্ট্রটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আদর্শ সংবিধান। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দেশের সম্মানিত আলেম এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মধ্য হতে বাছাই করা ৭২ জন সদস্য সংম্বলিত 'বিশেষজ্ঞ পরিষদ' একটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করেন। নতুন সংবিধানের প্রতি জনমত যাচাইয়ের জন্য ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ৯৯.৫% ভোটার ভোটদানের মাধ্যমে এই সংবিধানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। নতুন সংবিধানের

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের কার্যক্রম শুরু হয়। ইরানের বিপ্লব পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। এ পরিবর্তনের ফলে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের নীতি অনুসরণপূর্বক ইসলামি প্রজাতন্ত্র নিজস্ব ইসলামি কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। নিম্নে ইরানের সাংবিধানিক কাঠামোতে যে সকল ব্যক্তি ও সংগঠন কাজ করে তার একটি পরিচিতি উপস্থাপন করা হল–

১. সংবিধান :

২. রাহবার : 'বিশেষজ্ঞ পরিষদ' কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৩. বিশেষজ্ঞ পরিষদ: এটি ৭২ জন শ্রেষ্ঠ আইনবিদ এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিষদ।

৪. অভিভাবক পরিষদ: সংবিধান ও ইসলামি অর্ডিন্যান্সসমূহ সংরক্ষণ এবং মজলিস কর্তৃক পাসকৃত আইন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় 'অভিভাবক পরিষদ'।

৫. মজলিসে শুরা: মজলিসে শুরা (পার্লামেন্ট) সারাদেশ থেকে প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়।

৬. সরকারের নীতিনির্ধারনি পরিষদ: 'অভিভাবক পরিষদ' মজলিসের কোনো বিল পরপর দুইবার বাতিল বা সংশোধনযোগ্য ঘোষণা করা সত্ত্বেও মজলিস যদি তৃতীয়বারের মত একই বিল গ্রহণ করে তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে এবং এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭. প্রেসিডেন্ট: প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। (অবশ্যই রাহবার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৮. প্রধান বিচারপতি: রাহবার সরাসরি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইরানের বিচার বিভাগের দায়িত্ব হলো:

Dhaka University Institutional Repository

ক) ক্ষোভ, অধিকার লঙ্ঘন ও অভিযোগের তদন্ত করা ও রায় প্রদান এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ) জনগণের অধিকার পুনঃস্থাপন এবং ন্যায় বিচার ও বৈধ অধিকারসমূহের উন্নতি সাধন করা।

গ) আইনের যথাযথ প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা।

ঙ) অপরাধ উদঘাটন, অপরাধীদের বিচার করা ও শাস্তি প্রদান এবং বিধিবদ্ধ ইসলামি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা।

চ) অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করা ও অপরাধীদের সংশোধনের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৮৬]

৯. মন্ত্রী পরিষদ: মজলিস (পার্লামেন্ট)-এর আস্থা সূচক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন দান করেন।

১০. সর্বোচ্চ জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ: রাহবার কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধিবর্গ, বিচার, শাসন ও আইন বিভাগীয় প্রধানগণ, বৈদেশিক, তথ্য, প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীবর্গ, রাহবারের সামরিক প্রতিনিধি, সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান, ইসলামি বিপ্লব রক্ষী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণের সমন্বয়ে গঠিত।

১১. সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ: প্রেসিডেন্ট অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রী এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত।

১২. জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা: নির্বাহি পরিচালক রাহবার কর্তৃক মনোনীত হন।

১৩. নীতি নির্ধারণি পরিষদ: রাহবারের প্রতিনিধিবর্গ, মজলিসের প্রতিনিধিবর্গ, বিচার বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ, এবং নির্বাহি পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত।

১৪. নাগরিক স্বাধীনতা: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে নাগরিক স্বাধীনতা সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. নির্বাচন ব্যবস্থা: ভোট এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণই হচ্ছে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি।

৩. বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক সূচনা

বাংলাদেশ ও ইরান ভৌগলিকভাবে একই ভূ-অঞ্চলে অবস্থিত। ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্ত পরেই ইরানের অবস্থান। জাতিগতভাবেও আর্য হতে উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব চার থেকে পাঁচ হাজার পূর্বে বসবাসযোগ্য ভূমির সন্ধানে 'পামির' এলাকা হতে ইরানের দিকে যাত্রা করেছিল।[৮৭] প্রথমে এরা বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রজাতন্ত্র তাজিকিস্তানের অন্তর্গত সমরখন্দ ও বোখারা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্থানাভাবের কারণে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০ অব্দে এদের একটি দল খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে এবং অপর দলটি ইরানে প্রবেশ করে। ইরানি দলটির একটি অংশ উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের আশে পাশে উর্বর এলাকা মিডিয়ায় এবং অপর অংশ দক্ষিণ ইরানের উপকুলবর্তী এলাকা 'ফারস' এ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। অতপর মিডিয়ায় 'আলমন্দ' এবং ফারসে 'হাখামানশি' নামে দুইটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে ফারস-এর হাখামানশি রাজবংশ অধিকতর উন্নতি সাধন করে এবং এক পর্যায়ে মিডিয়া দখল করে নিজেদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। তখন থেকেই সমগ্র এলাকা ফারস নামে অভিহিত হয়।[৮৮] অন্যদিকে আর্যদের ভারতে প্রবেশকারীরা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে থাকে। সুতরাং এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে ইরান ও ভারতবাসী তথা বাংলাদেশীগণ আর্যদেরই বংশোদ্ভূত। ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্যদিয়ে। একই গোত্রীয় হওয়ায় এ দুই জাতির মাঝে ভাষা সংস্কৃত ও চলাফেরার মিল লক্ষ্য করা যায়। যার স্রোতধারা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বয়ে চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. ড. হীহার রঞ্জন রায়, *বাঙগালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৪১৬ বাংলা সন, পৃ. ৬৮-৭০।

২.http://www.dghs.gov.bd/licts_file/images/Health_Bulletin/HB2012_CH/HB2012_CH1_BD-at-a-glance.pdf p.13.

৩. *Ibid*.

৪. *Ibid.*

৫. *Ibid.*

৬. *Ibid*. P. 14.

৭. *Ibid*. P. 13.

৮. কে আলী, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১।

৯. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, জাতিয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৩।

১০. রাখালদাস বন্দোপধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বইপত্র, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৬।

১১. এমাজ উদ্দিন আহমদ ও হারুন অর রশীদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩ (রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি)*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৭২।

১২. *প্রাগুক্ত।*

১৩. কে. এম . রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪১।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

১৫. Sayed Abul Hasan Ali nadwi (trans. by Mohammad Asif Kidwai), *Muslims in India,* Islamic Research and Publications, Lucknow, India, 1980, p. 1.

১৬. সুখময় মুখোপধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা,২০০৫, পৃ. ৭।

১৭. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

১৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, নবম খণ্ড , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৪০।

১৯. কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯০।

২০. *প্রাগুক্ত*।

২১. মুহাম্মাদ ইনাম-উল-হক, *বাংলার ইতিহাস ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯।

২২. শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪৬৭।

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৪।

২৫. Shireen Hasan Osmany, *Evolution of Bangladesh ,* A.H. Development Publishiling House, Dhaka, 2014, p. 431.

২৬. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৫।

২৭. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন ও তৎকালিন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৪।

২৮. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

২৯. শারমিন খান সুবর্ণা (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫৬।

৩০. আফসার ব্রাদার্স (সম্পাদিত), *মহান একুশে ফেব্রুয়ারী ইতিহাস ও স্মৃতিচারণ*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ.১৪৯।

৩১. ড. মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯০।

৩২. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২।

৩৩. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন(সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৩৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, *১০ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।

৩৫. *প্রাগুক্ত।*

৩৬. *প্রাগুক্ত।*

৩৭. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত।*

৩৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১০ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

৩৯. Rounak Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* University Press ltd., Dhaka, 2001, P. 45.

৪০. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৫।

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৬।

৪২. জাতির জনক এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি (২৬ মার্চ থেকে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)। শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপাল গঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। (সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১২ তম খন্ড , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩)। তাঁর পিতারনাম ছিলো শেখ লুৎফর রহমান, মাতার নাম মোসাম্মৎ সায়েরা বেগম। শেখ মুজিব পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান, তবে প্রথম পুত্র। তাঁর ৪ বোন ২ ভাই ছিলো। শেখ মুজিবের ডাক নাম ছিলো 'খোকা'। মাত্র আঠারো বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে শেখ মুজিবের বিয়ে হয় ফজিলাতুন্নেসা ওরফে রেনুর সঙ্গে। এদের তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা-শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ হাসিনা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী)

Dhaka University Institutional Repository

এবং শেখ রেহানা। (মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূরুল কাদির, *দূশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৭০)।

৪৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১ জুন, ১৯৭০।

৪৪. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩১।

৪৫. মো. কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: উৎস অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২।

৪৬. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট*, কাকলি প্রকাশনি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬১।

৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২।

৪৮. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪২।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫২।

৫০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনীর প্রধান। ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়া জেলার বাগবাড়ীতে জিয়াউর রহমানের জন্ম। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সংঘঠিত এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। (সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১২ তম খণ্ড , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫, ৩৮)।

৫১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১২ তম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৫২. মেজর অবঃ রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৬৫।

৫৩. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৯।

৫৪. মেজর অবঃ রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

৫৫. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১।

৫৬.আলী আকবর দেহখোদা, ডাঃ মোহাম্মদ মুঈন (সম্পাদিত)-*লুগাতনামে*, তেহরান, দানেশগাহে তেহরান, ১৩৪২ হি. শা., পৃ. ৫৫৬।

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ. ৫৯১।

৫৮. E.G Browne, *A literary History of Persia, Vol-1,* Cambridge University Press, London, 1929, p. 4.

৫৯. এম, এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)*, বিশ্বদ্যিালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫৯।

৬০. সৈয়দ হোসাইন মোহাম্মদ জাফরী, অনু. মনজুর আলম, *শিয়া মাজহাবের উৎপত্তির ইতিহাস*, ঢাকা, মাসুম পাবলিকেশন, ১৯৯২, পৃ. ১।

৬১. মুহাম্মদ ইনাম উল হক অনূদিত, *মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান*, ইয়াহিয়া আরমাযানি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৬১-১৬২।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৬৩. নাসের আযিমী দোবাখশারি, *জুগরাফিয়ে ইরান* (ইরানের ভুগোল), ইরানি শিক্ষা মন্ত্রনালয়, তেহরান, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪.আবদুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ১।

৬৫. *প্রাগুক্ত*।

৬৬. W.B. Fisher Edited. *The Cambridge History of Iran,* Vol- 1, Cambridge University Press, Newyork, 1968, p. 3.

৬৭. নাসের আযিমী দোবাখশারি, *প্রাগুক্ত*।

৬৮. https://www.google.com.bd/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=national+population+and+housing+census+2011+national+report+of+Iran.p.7.

৬৯. *Ibid* . p. 8.

৭০. Roger Howard, *Iran in crisis? Nuclear ambitions and the American response*, Zed Books ltd., London, 2004, p. 15.

৭১. *Ibid*.

৭২. হাসান আল চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৩, পৃ. ২৩।

৭৩. মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, আদাবনামেয়ে ইরান, লাহোর, নিগারিশাত, তা. বি. পৃ. ১-২।

৭৪. সব ঐতিহাসিকই ১১৫০-১১৬৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময় তার জন্ম। চেঙ্গিসের পিতার নাম ইউসুগেই, মাতার নাম হোয়েলান। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় তিমুজিন। চেঙ্গিস শব্দের অর্থ সাগর, কেউ কেউ বলেন ক্ষমতাবান।

৭৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আবু নদভী, *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, (অনু.)আবু সাঈদ মোহাম্মদ উমর আলী, ১ম খণ্ড, মোহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১৫।

৭৬. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩৩।

৭৭. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৩৫।

৭৮. *প্রাগুক্ত*।

৭৯. এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্ত্বা রাষ্ট্র*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৪৩।

৮০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩।

৮১. এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৩।

৮২. S. M. Imamuddin, *A Modern history of the Middle east and North Africa,* Najmasons Ltd., Dacca, 1968, P. 184.

৮৩. Donald N. Wilber, *Iran Past Present,* Princeton University Press, New Jersey, USA, 1976, p. 332.

৮৪. Reza Shah Pahlovi, *Mission for my country,* Hutchinson & co. Ltd., London, 1961, p. 237.

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. Ayatollah Ruhullah Musavi Khomeini was born in 1902 in Khomein in central Iran. His father was killed because of his opposition to the oppressive regime of the Qajar dynesty when Ruhollah was only five months old and trherefore was raised by his older brother Mortaza. at the age of nineteen, upon completion of the early stages of his education, Ruhollah moved to arak in order to continue his higher education under one of the greeatest Muslim theolosians of the time, Ayatollah Hairi, the man who later founded several religious school in Qum. He married in 1928 and had three dauguter and two sons, His first book, *Kashef Ol-Assraar* (Unveilling the Mysteries),

(Embassy of the Islamic Republic of Iran Dhaka compiled, *News Letter*, No-09, February, 11, 1980, P. 1-2).

৮৬. ড. তারেক মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, *ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৪ ।

৮৭. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সাহিত্য পত্রিকা*, সংখ্যা, ৩০ জুন ১৯৯৬, (বাংলা ভাষায় আরবী ফারসি শব্দ ও অভিধান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৫৮ ।

৮৮. *প্রাগুক্ত* ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা

৩. ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৪. ইরানের ইসলামি বিপ্লবে বাংলাদেশের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা

১৯৭১ সালে মহান মক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও ১৯৭৯ সালে ইরানের গণজাগরণের ফলে রাজতন্ত্র ইরান থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিষ্ঠার দুটি আন্দোলনেই জনতার জয় পরিলক্ষিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরু ইরান পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে মুসলিম ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নামে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যও প্রদান করে। নতুন মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইরানের ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী নতুন সরকারকেও স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। বরং মুসলিম দেশ হিসেবে এদেশের আপামর জনতা ও মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহল তাদের লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবকে স্বাগত জানান। এ দুটি আন্দোলন পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এ দুদেশের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে। আলোচ্য অধ্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়া ও ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ও উভয় দেশের সশস্ত্র জনগণের এ আন্দোলনের ওপর আলোচনা ও আন্দোলনকালীন উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন এবং ছেষট্টির ছয়দফা, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন বাঙালির নিরঙ্কুশ জয়লাভের পরও অন্যায়ভাবে পাক-দখলদার বাহিনী পেশী শক্তি প্রয়োগ করে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর অতর্কিত ঝাপিয়ে পড়ে ২৫ মার্চ কালো রাতে।[১] পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে এদেশের জনসাধারণ স্বাধীকার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন বাঙালি যে দিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে-'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সেই বাঙ্গালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, অসাধ্য সাধন করেছে।[২] দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তান হতে আলাদা হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। নিম্নে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপন করা হল।

অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তানের একচেটিয়া আধিপত্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। অর্থনৈতিক বিষয় সমাধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব, তা উপলব্ধি করে বাঙালিরা 'তুমিও বাঁচো ও আমাকে বাঁচতে দাও' নীতি গ্রহণ করে। এ নীতি থেকে জন্ম লাভ করে ছয়দফা কর্মসূচী।[৩] ষাটের দশকে দু' অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) প্রবৃদ্ধিও হার ছিল যথাক্রমে পূর্বাংশে ৪.৩% এবং পশ্চিমে ৬.৪%। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট উদ্বৃত করে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার সারাংশ হলো- ১৯৫৫-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির অংশ ছিল ৩৮.৬% এবং রতানির বাদবাকি ৬১.৪% হতো পূর্ব বাংলা থেকে। বৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে সারণি ২.১ ও ২.২ তে-

সারণি ২.১

পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯৫৮-৬৮

পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
রফতানি	আমদানি	রফতানি	আমদানি
৮২ কোটি পাউন্ড ৪১%	২৩১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড ৭০%	১১৫ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড ৫৯%	১০০ কোটি পাউন্ড ৩০%

উৎস: *Bangladesh Documents,* Vol. 1 (Delhi : Ministry of External Affairs, Government of India, 1971).

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২.২

পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ হস্তান্তর

(১০লক্ষ টাকার হিসেবে)

	বিষয়	১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৮-৬৯	১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯
১	পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্য	৪৮৪০	১৪৪৯০	১৯৩৩০
২	জনসংখ্যার অনুপাতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হিস্যা	৮৪৩০	২৬৭১০	৩৫১৪০
৩	পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য স্থানান্তর	+৩৫৯০	+১২২২০	+১৫৮১০
৪	পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট	+৫৩৭০	-৯৩৯০	-৪০২০
৫	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ হস্তান্তর ৩+৪	+৮৯৬০	+২৮৩০	১১৭৯০

উৎস: *চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থণীতিবিদদের প্যানেলের রিপোর্ট।*

সারণি ২.১-এর চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের মোট রফতানি থেকে যে অর্থ আসতো তাতে পূর্ব বাংলার অবদান ছিল অনেক বেশী। এই মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো পাকিস্তানের প্রধান রফতানি দ্রব্য পাট থেকে।

পূর্ব বাংলা থেকে সম্পদ দুভাবে পাচার হতো। প্রথমত, পূর্ববাংলার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প গড়ে উঠতো। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত দ্রব্য

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রীর বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতো পূর্ববাংলা। সারণি ২.২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কীভাবে পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমাংশে সম্পদ স্থানান্তর হচ্ছে। এর সাথে যদি পশ্চিম পাকিস্তানকে ছেড়ে দেয়া পূর্ব বাংলার প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্যেও অংশকে যোগ করা হয় তখন পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমে সম্পদ হস্তান্তরের ব্যপকতা পরিমাপ করা সম্ভব।[৪]

অনেক উপায়ে অর্থনৈতিক শোষণকে পাকাপোক্ত করেছিল পাকিস্তান সরকার। নিম্নে সারণির মাধ্যমে তার কিছুটা উল্লেখ করা হলো।

সারণি-২.৩

পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে পূর্ব বাংলার অংশগ্রহণ

পদ	কোটা	বাস্তবে চাকরিরত
অফিসার	কোন কোটা বরাদ্দ নেই	৫%
জুনিয়র কমিশন অফিসার	৭.৮%	৭.৪%
সৈনিক	৭.৮%	৭.৪%

বিমান বাহিনী

অফিসার	১৬%
ওয়ারেন্ট অফিসার	১৭%
অন্যান্য পদে	৩০%

নৌবাহিনী

অফিসার	১০%
শাখা অফিসার	৫%
প্রধান পেটি অফিসার	১০.৪%
পেটি অফিসার	১৭.৩%

সূত্র : ১. *Dawn (Karachi), january 8, 1956.*

2. Pakistan National Assembly Debates, 8 March 1963.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২.৪

সিভিল সার্ভিসে পূর্ববাংলার অংশ

বছর	সার্ভিসের নাম	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬৮	পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস	১৮৬	৩২৬
১৯৬৭	পাকিস্তান আয়কর সার্ভিস	৮৬	১৪১
১৯৬৭	পাকিস্তান অডিট এন্ড একাউন্টস	৪৪	৯৫
১৯৬৭	পুলিশ	৮২	১২৮
১৯৬৭	কেন্দ্রিয় তথ্য সার্ভিস	১৯	৪৯

সূত্রঃ *Pakistan Observer,* 19 June, 1968.[5]

অনুরূপভাবে শিক্ষা খাতেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে তার কিছু অংশ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২.৫

শিক্ষাখাতে বৈষম্য

ক্ষেত্র	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্বপাকিস্তান
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৪৭-১৯৪৮ ১৯৬৮-৬৯ ৮৪১৩ ৩৯৪১৮ সাড়ে চারগুণ হারে বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮ ১৯৬৮-৬৯ ২৯৬৬৩ ২৮৩০৮ যদিও শিশুদের সংখ্যা বেড়েছে তবু বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমেছে।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫৯৮ ৪৪৭২ ১৭৬% বৃদ্ধি	৩৪৮১ ৩৯৬৪ ১৪% বৃদ্ধি
বিভিন্ন ধরণের কলেজ	৪০ ২৭১ ৬৭৫% বৃদ্ধি	৫০ ১৬২ ৩২০% বৃদ্ধি
মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৪ ১৭ ৪২৫% বৃদ্ধি	৩ ৯ ৩০০% বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধিজীবির সংখ্যা	২ ৬৫৪	৬ ১৮৭০৮	২ ১৬২০	৪ ৮৮৩১
	৩০গুণ বৃদ্ধি		পাঁচগুণ বৃদ্ধি	

সূত্রঃ *Bangladesh Documents*.[6]

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কারণে গোটা বাঙালি জাতি আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং ঐ বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।[৭]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতা হস্তান্তরে নানাপ্রকার তালবাহানা শুরু করে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং ঐ দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। অর্থ্যাৎ ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সবকিছুই অস্বীকার করা হয়।[৮] পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ও ৬ দফার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হওয়ার কথা ভেবে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্ত-রের ব্যাপারে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। ছয়দফার সমালোচনা তৎকালীন মুসলিম লীগের সভাপতি বলেন, জয়বাংলা শ্লোগান হচ্ছে যুক্ত বাংলার চক্রান্ত।[৯] অথচ, দাবি জানানো স্বায়ত্তশাসন নতুন কিছু নয়। এমনকি পাকিস্তানের ভিত্তি হিসেবে খ্যাত লাহোর প্রস্তাব, যার খসড়া জিন্নাহ নিজেই করেছিলেন তাতে বলা হয়েছে, ভারতকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে পূর্বে ও উত্তর পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে একের অধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে যার ইউনিটগুলো হবে স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত।[১০] কিছুদিন পর পাকিস্তান সরকার ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ৩ জানুয়ারি রমনা (রেসকোর্স) ময়দানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শপথ দিবস উদযাপন করে। শপথ অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান নির্বাচিত সদস্যদের উদ্দেশে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। ৪ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে রমনা (রেসকোর্স) ময়দানে ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের তালবাহানা সম্পর্কে জনগণকে অভিহিত করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে ১১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। এবং ১২ ও ১৩ জানুয়ারি দুদফা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে বৈঠক করেন। ঢাকা ত্যাগ এর সময় তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা সফল হয়েছে বলে বঙ্গবন্ধুকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে অতি শিঘ্রই সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি দুই পক্ষের আলোচনা চললেও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের এ সকল তালবাহানার মাঝে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশের এ উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবস্থার প্রতিকূলতা দেখে ইয়াহিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ঢাকায় ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এতে জুলফিকার আলী ভুট্টো বিরোধীতা করেন। তার দাবি ছিল, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৭ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) জাতীয় পরিষদে ৮৩ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তেমনিভাবে পি.পি.পিও পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং সে কারণে উভয় দলকে সম্মিলিতভাবে সরকার গঠন

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে। এর বাইরে তিনি জাতীয় পরিষদে যোগ দেবেন না। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে কে. এম. মোহসীন বলেন-

> ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকট বাঙালি জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। জনগণ যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সাথে সমঝোতা বৈঠক চলাকালে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভরত জনগণ যুদ্ধ করার মানসিকতা প্রদর্শন করছিল। অবসর প্রাপ্ত সৈন্যরা পল্টন ময়দানে কেবল মার্চপাস্ট করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁরা উদ্দীপ্ত তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আরম্ভ করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করতে শুরু করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল সমগ্র জাতি যেন স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের আহ্বানের জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবে অপেক্ষা করছিল।[১১]

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১ জানুয়ারি ১৯৭১ সালের বেলা ১ টা ৫ মিনিটে রেডিওর মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে সবাইকে অবহিত করলেন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনিবার্য কারণবশত অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকবে।[১২] এ ঘোষণার সাথে সাথেই সহিংস প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রথম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামে তখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চলছিল। স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শক জয় বাংলা শ্লোগান তুলে রাজপথ প্রকম্পিত করে তুলে এবং ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনগণ অল্প সময়ের ব্যবধানে ঢাকাকে মিছিলের নগরীতে পরিরণত করে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হোটেল পূর্বানীর সামনে উত্তেজিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন- ষড়যন্ত্রকারিদের সুবুদ্ধি ফিরে না এলে ইতিহাস তার আপন গতিতে চলবে। তিনি আরো বলেন-২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হবে।[১৩] ৭ মার্চ রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ময়দানে জনসভার কথাও ঘোষণা করেন। এছাড়া আরো নির্দেশ দেন যে, ৩ মার্চ হতে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল পালন করুন। জনগণের প্রতি উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের স্বার্থ ক্ষুন্ন করবে এবং গণবিরোধী শক্তি ও তাদের ভাড়াটিয়া চরদের স্বার্থোদ্ধার করবে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে এক প্রতিবাদ সভায় তৎকালীন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন বক্তৃতা করেন।[১৪] ডাকসুর সহ-সভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। উক্ত সভায় তোফায়েল আহমদও উপস্থিত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে এক বিশাল শোভাযাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়ে বায়তুল মোকাররমে শেষ হয়।

২ মার্চ ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং সরকার কর্তৃক কারফিউ জারি করা হলে সংগ্রামী জনতা তা উপেক্ষা করে মিছিল সমাবেশ করেন। এদিন ঢাকায় তিন জন নিহত ও নয় জন আহত হয়।

এ সময় জামাতে ইসলামি ও চীনাপন্থী দুয়েকটি সংগঠন বাদে সকল রাজনৈতিক দল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দেয়। এ অবস্থায় ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার আহবান জানিয়ে ২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধুকে একটি খোলা চিঠি লিখে। এ সময় স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাওলানা ভাসানী সারাদেশে একটি কমিটি গঠন করে শেখ মুজিবুর রহমানকে এর নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানান। ২ মার্চ পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সিরাজ শিকদার সারাদেশে প্রচারিত এক খোলা চিঠির মাধ্যমে শেখ মুজিবকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ২ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল জনসভায় দলের নেতৃত্ব সকল ভেদাভেদ ভুলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ৩ মার্চ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ইয়াহিয়া খান দশজন রাজনৈতিক নেতার সাথে বৈঠক আহ্বান করলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৩ মার্চ সারাদেশে পূর্ণ দিবস হরতাল পালন কালে সরকারি বাহিনীর হাতে ৪৭ জনের মত নিহত হন এবং ৩৮০ জনের মত আহত হন, যাদের অধিকাংশের দেহে বুলেটের ক্ষত

Dhaka University Institutional Repository

চিহ্ন ছিল। ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ আকস্মিক এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এবং একই দিন টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ- বীর বাঙালি অস্ত্রধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়-বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার আমার ঠিকানা-পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার দেশ আমার দেশ-বাংলাদেশ বাংলাদেশ, শ্লোগান দিয়ে সমাবেশে যোগ দেন। উক্ত সমাবেশে শেখ মুজিবর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন যেটি ছিল বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ। তিনি মঞ্চে উঠে বলেন-

> আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়-তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদীতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী করে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম করে রাখল। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেয়া হল এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হল। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন।
>
> জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন, তার সঙ্গে আলোচনা হল। ভুট্টো সাহেব বলে গেছেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়। তবে তাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬-দফা পরিবর্তনের কোন অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ, রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি, শহিদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাব না। আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট কাচারী, হাই কোর্ট, সুপ্রীম কোট, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না-এ আমার নির্দেশ।

Dhaka University Institutional Repository

এ দেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন। আমরা তাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। আমি যদি হুকুম দেবার জন্য না থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ।

আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১৫]

৭ মার্চের ভাষণের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বিদেশে বসবাসরত বাঙালিরা বিভিন্ন দেশে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ। ৮ মার্চ হরতালের আওতা নির্দেশনা দিয়ে তাজউদ্দিন আহমদ এক বিবৃতি দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। মূলত ৭ মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।[১৬]

৯ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গবন্ধুর এ সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্যে সংগ্রামী জনতার প্রতি সকল এলাকায় গণবাহিনী গঠন করার আহ্বান জানান। একই দিনে মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানের এক জনসভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দান করে জনগণকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ৭ কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা দানের আহ্বান জানান।

১১ মার্চ সি. এস. পি ও ই.পি.সি.এস সমিতির পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং আওয়ামী লীগের তহবিলে ১ দিনের বেতন প্রদান করেন। ১১ মার্চ সরকারি কর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করেন এবং ওই কর্মচারীদের পরিচালনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৪ মার্চ ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে ইয়াহিয়াকে আহ্বান জানান। ১৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু দেশের শাসনভার পরিচালনার জন্য ৩৫টি নির্দেশ জারী করেন।

১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসেন। ১৭, ১৮, ও ১৯ মার্চ এর আলোচনায় উভয়ের মাঝে কিছুটা আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। উক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের পূর্বে দাবীকৃত ৬ দফায় অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি আলোচনায় আসে। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে যাওয়া এ আলোচনার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে আফসান চৌধুরী বলেন-

> ছয়দফার ওপর বাস্তব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র ১৯৭১ সালের সেই সংকটময় দিনগুলোতে, যখন ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও কামাল হোসেনের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনার জন্য জাস্টিস কর্ণেলিয়াস ও কেন্দ্রীয় সরকারের লিগ্যাল ড্রাফটসম্যান কর্নেল হাসান সহ এম. এম, আহমেদকে নিয়ে আসেন। আওয়ামী লীগের আলোচকদের সহায়তা করে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের একটি দল। অর্থনীতিবিদরা বৈঠকে উত্থাপিত সকল অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের আলোচকদের সাথে আলোচনা করেন। পাকিস্তানের অর্থনীতির এককালের ক্ষমতাবান মুঘল এম. এম আহমদ ছয় দফার মূল অর্থনৈতিক দফাগুলো মেনে নেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় আলোচক দল ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ পূর্বপাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাংবিধানিক পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ঐক্যমতে উপনীত হন।[১৮]

পরবর্তীতে মুজিব-ইয়াহিয়া এই মর্মে একটি চুক্তিতে উপনীত হন যে,

১. একটি ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।

২. অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রথমে প্রদেশ সমূহে ও পরবর্তীতে কেন্দ্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

২১ মার্চ জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় আগমনের পর দ্বি-পক্ষীয় আলোচনা পরিণত হয় ত্রি-পক্ষিয় আলোচনায়। ২৩ ও ২৪ মার্চ ত্রি-পক্ষীয় বৈঠকে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভূট্টো বিরোধিতা করে। উক্ত আলোচনার পাশাপাশি এ অঞ্চলে স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ২৩ মার্চ উত্তাল আন্দোলনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমিনুর রহমান সুলতান বলেন-

> ২৩ মার্চকে শেখ মুজিব সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ দিনে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে পালন করে 'প্রতিরোধ দিবস'। সকাল ৯ টায় পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় জয় বাংলা বাহিনীর। শেখ মুজিব তার বাসভবনে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা উত্তোলন করেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ভবনেই পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা পত পত শব্দে উড়তে থাকে। ঢাকার দৈনিক পত্রিকা গুলো 'পাকিস্তান দিবসের' পরিবর্তে 'বাংলাদেশের মুক্তি দিবস' রূপে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে । এমনি ভাবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সামরিক বাহিনীর নিপীড়ন যতই বাড়ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি ততোই ফিকে হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হচ্ছিল । সর্বত্র মিছিল, শোভাযাত্রা, কারফিউ ভেঙ্গে মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার জন্য দাবি উন্থাপন করতে থাকে।[১৯]

২৪ মার্চ শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মাঝে সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু উক্ত বৈঠকটিও পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে মূলতবী হয়ে যায়। ২৫ মার্চ সকাল ৯ টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে ভূট্টো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার ওপর তার 'না' সূচক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

২৫ মার্চ পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ ঢাকা ত্যাগ করে। তাদের ঢাকা ত্যাগের পরপরই সামরিক বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার বাইরে রংপুরে, চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী কর্তৃক নির্বিচার গুলি বর্ষণ করে ১১০ জনকে হত্যা করলে বঙ্গবন্ধু ২৭ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চ পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের দায়িত্ব দিয়ে নারকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা রাত ৯টায় 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর মাধ্যমে ঢাকা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয় । তাদের এই পরিকল্পনায় ছিলো-

১. পিলখানায় অবস্থিত ২২ নম্বর বালুচ রেজিমেন্ট সেখানে বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালি ই.পি. আর সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে।

২. ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে এক হাজার বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করবে।

৩. ১৮ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট নবাবপুর ও পুরনো শহরে হামলা চালাবে।

৪. ২২ নং বালুচ, ১৮ ও ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ করবে।

৫. বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডার সৈন্য শেখ মুজিবের বাড়ী আক্রমণ করবে এবং তাঁকে জীবন্ত ধরে আনবে।

৬. ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী এবং বিহারীদের এলাকা (মিরপুর-মোহাম্মদপুর) পাহারা দেবে।

৭. ভয় দেখানোর জন্যে ট্যাংক বহরের একটি ছোট্ট স্কোয়াড তৈরী থাকবে। প্রয়োজন হলে তারা গোলাবর্ষণ করবে।

৮. উপরিউক্ত সৈন্যরা রাস্তায় প্রতিরোধ হলে তা ধ্বংস করে দেবে এবং তালিকাভূক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ীতে হানা দেবে।[২১]

তেইশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করার পর বাঙালিরা ১৯৭০'র নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা লাভ করতে ব্যর্থ হলে তারা বাধ্য হয় স্বাধীনতার চিন্তা করতে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠিরাই বাঙলিদেরকে বাধ্য করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করতে।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনও গ্রেফতার হননি। তিনি বাংলাদেশের এই কালো রাত্রির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেও নিজ বাসভবনে থেকে গেলেন। এবং বাংলার মানুষের জন্যে এক বাণীতে তিনি বলেন-

> I call This may be my last message. From today Bangladesh is independent. upon the people to Bangladesh whatever you might be and with whatever you have to recite the army of occupation to the last. Your fight must go an until the last solder of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.[23]

(এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা যে যেখানে থাকুন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটির বিতাড়িত এবং চুড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।) [২৪]

সেই বিভীষিকাময় রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নূরুল কাদির বলেন-

> সেই মাঝ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রাতের আধারে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চুপিসারে রাজারবাগ পুলিশ লাইন , পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ ব্যারাক সমূহ, পিল খানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস- এর হেডকোয়ার্টার, সেখানকার সেনানিবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ঢাকার বিভিন্ন বস্তি এলাকা ইত্যাদি ঘেরাও করে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করছিল।[২৫]

সেই ভয়াল কালো রাতে একই সময়ে হামলা চালানো হয় রাজনীতির মূলকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। রাতের অন্ধকারে 'সাঁড়াশি আক্রমণ' চালিয়ে তারা অসংখ্য ছাত্র ও শিক্ষককে হত্যা করে। ছাত্ররাও কোথাও কোথাও প্রতিরোধ গড়ে তুলেও সাফল্য বয়ে আনতে পারেনি। লাশের পর লাশ পড়েছিলো হলগুলোতে। এছাড়া 'ঢাকার বাইরের সেনানিবাসগুলোতেও একই সময় হামলা চালানো হয়। কিন্তু সে সমস্ত সেনানিবাসের বাঙালি অফিসার ও জওয়ানেরা যথাসম্ভব দ্রুত অস্ত্রসহ নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রাথমিক অবস্থায় সমস্ত বাঙালি নেতারা বিদ্রোহের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পরদিন রাতে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে শেখ মুজিবুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করা হলে তাদের সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়। আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ আন্দোলনকে তারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত করেন। ফলে বিদ্রোহী সেনাদের দমন করে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পুরোপুরি সামরিক নিয়ন্ত্রণ বহাল করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যায়।[২৬]

২৫ মার্চের রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে পাকিস্তান বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হবার পূর্বে ই. পি. আর এর ওয়ারলেস যোগে একটি বার্তা পাঠানো হয় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান ২৬ মার্চ দুপুরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বলিত বাণীটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেন।[২৭]

২৭ মার্চ ঐ কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন-

> The Government to the soverign state of Bangladesh on behalf of our great leader, the superme commander of Bangladesh sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the government heads by Sheikh Mujibur Rahman, has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of the seventy five million people of Bangladesh, and the people of the independent sovereign state of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognized by all the Governments of the word. I there fore, appeal, an behalf of our greet leader Sheikh Mujibur Rahman, to the Governments of all the democratic countries of the world, specially the big powers and the neighboring countries to recognize the legal government of Bangladesh and take immediate measures for stopping the awful genocide that has been carried and by the army of occupation from Pakistan .
>
> The gaining principle of the new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all enmity to none. May Allah help us, joy Bangla.[28]

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা। এ হত্যাযজ্ঞের নিন্দা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিতে থাকে। পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র হস্তক্ষেপমুক্ত নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বশাসনের পক্ষে নিরঙ্কুশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিনিময়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পেয়েছে গণহত্যার মত আঘাত যা এখনো নির্লজ্জের মতো তারা চালিয়ে যাচ্ছে।[২৯] 'স্রষ্টা ও অখণ্ড পাকিস্তানের নামে' পশ্চিম পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ওপর নির্মম সেনা আক্রমণ চালিয়ে স্রষ্টা ও পাকিস্তান উভয়কেই অসম্মানিত করেছে।[৩০]

পাকিস্তানিদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ ও আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নেতৃবর্গ সেখানে অবস্থানকালে দেশে যুদ্ধের পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান পূর্বক প্রবাসী সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গণপ্রতিনিধিগণ বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা তথা মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ত্বরান্বিত এবং রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার জন্যে 'গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করে। ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনূন্য ৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক বিপুল জন সমাবেশে প্রকাশ্যে এই নবজাত রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়।[৩১] মুজিব নগর সরকারের যে বিষয়গুলোর ওপর নজর দেওয়া যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে-

-সরকার সৃষ্টির উৎস ও প্রতিরোধ

-সরকারের নীতিমালা, চরিত্র ও গ্রহণযোগ্যতা

-সরকারের প্রধান কার্যক্রম

-সরকারের রাজনীতি।[৩২]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণা পত্র পাঠ করেন জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী। অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ হলেন-

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতিঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

উপ রাষ্ট্রপতিঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম (তিনি রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পান।)

প্রধান মন্ত্রীঃ জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ

পররাষ্ট্র, সংসদ ও আইন মন্ত্রীঃ খন্দকার মুশতাক আহমদ

অর্থ, বাণিজ্য ও পূনর্বাসন মন্ত্রীঃ জনাব এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধানঃ কর্নেল মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী।

মহান মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তোলার জন্য এ সরকার কর্তৃক সারা দেশকে ৪ টি অঞ্চল ১ ও ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে এ চারটি অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন মেজর খালেদ মোশারফ-সিলেট ও কুমিল্লা। মেজর জিয়াউর রহমান-চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী। মেজর সফিউল্লাহ-ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল। মেজর এম. এ. ওসমান গণি -দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল।

এছাড়াও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল-

১) নিয়মিত সেনাবাহিনী, এই বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের নিয়ে গঠিত। এরা মুক্তিফৌজ অর্থাৎ এম. এফ. নামে পরিচিত ছিলো।

২) গণবাহিনী বা এফ. এফ. এই বাহিনী শিক্ষক থেকে শুরু করে চাকুরীজীবী, কৃষক, শ্রমিক, কিশোর যুবক এক কথায় সর্বশ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত। এরা মূলত দেশের ভেতরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছিলো।

পাকিস্তানের এ আচরণের পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে ১১ থেকে ১৭ জুলাই সেনা সদর দপ্তরে তাজ উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কর্নেল ওসমানী সহ সিনিয়র সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধ পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যুদ্ধের মূলনীতিতে কিছু পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

করে প্রথাগত যুদ্ধের স্থলে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

ক. সার্বিকভাবে একটি কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি, লে. কর্নেল এম এ রবকে চীফ অফ স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত করা হয়।

খ. সম্পূর্ণ বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সেক্টরের জন্য সীমা নির্দিষ্টকরণ ও সঠিকভাবে চিহ্নিত করণ করা হয়।

গ. দেশের মধ্যে গেরিলা অবস্থান তৈরী করা এবং তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সাথে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।

ঘ. প্রতিটি গেরিলা ঘাঁটিতে যুদ্ধাহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মেডিকেল টিম এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য উপদেষ্টা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ঙ. যুদ্ধ পরিচালনার মূল লক্ষ্য হয় পাক সৈন্যদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া।

চ. ঢাকাসহ সারাদেশে গেরিলা-তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

ছ. মুক্ত এলাকার কর্তৃত্ব গ্রহণ ও সমন্বিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি নিয়মিত বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৩৩]

এ সময়ে এয়ার কমান্ডার এ কে খন্দকার এর অধিনায়কত্বে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। এছাড়াও আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের বাছাই করা তরুণ ও শিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে ভারতেই গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। এই বাহিনী গঠনের উদ্যোক্তাগণ ছিলেন তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক।

প্রায় ছয় মাস যুদ্ধ করার পর পাকিস্তানিরা এ অঞ্চলের গভর্ণর পরিবর্তন করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর টিক্কা খানকে গভর্ণর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে এম. এ. মালেককে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। ২৪ সেপ্টেম্বর গভর্ণর এ এম মালেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো থেকে বাছাই করে এবং আওয়ামী লীগের দুজন সদস্য নিয়ে ১০ জন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান আশ্বাস প্রদান করলেও ৯ আগস্ট আবার ইয়াহিয়া খান এক প্রেস নোটে জানান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য ১১ আগস্ট থেকে শেখ মুজিবের বিচারের কাজ শুরু করা হবে।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারত পাকিস্তানের এ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করে। দ্রুতই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট বিজয় আর ঘটেনি, অহংকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের ধূলিতে নামিয়ে আনতে ঠিক দুসপ্তাহ সময় লেগেছে।[৩৪] নিরুপায় পকিস্তানিরা বাঙ্গালি জাতিকে বিনাশ করার মানসে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরী করে এবং সে অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিক ও চিকিৎসককে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়।

১৯৪৭ থেকে আঠারো বছর ধরে পাকিস্তান অস্তিত্বের চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিজ সাধ্যের উচ্চতম বিন্দুতে উঠে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের ধাক্কায় গড়াতে গড়াতে খাড়া উৎরাই নেমে মাত্র ছ'বছরের মধ্যে ১৯৭১-এর পরিণতি বরণ করলো।[৩৫] ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪.৩০ টায় ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতার সামনে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি। উক্ত আত্মসমর্পণের দলিলে লেখা হয়-

> পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পনে সম্মতি প্রদান করেছেন। এই আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থানরত পাকবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য, সকল আধা সামরিক এবং অসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এই সকল সৈন্যরা যে যেখানে যেভাবে আছেন সেভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধিনস্থ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করবেন। এই দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জেঃ অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পণ চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলী ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আত্মসমর্পণ চুক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লেঃ জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেন যে, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। লেঃ জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। [৩৬]

উক্ত দলিল স্বাক্ষরের পর পরই স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় উৎসব পালন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের যে স্থানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন সে স্থানে বিশাল হর্ষোৎফুল্ল জনতার উপস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনীর সমর নায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসার সহ আত্মসমর্পন করেন।[৩৭] চেঙ্গিস খান তার ভয়ঙ্কর নির্মমতায় জীবনে অন্তত একটা সাম্রাজ্য গড়তে পেরেছিলেন। আর টিক্কাখান ও তার উর্দি পরা কসাই সাঙ্গপাঙ্গদের ইতিহাস তাদের মনে রাখবে একটি জাতির বৃহদাংশের ধ্বংসকারী হিসেবে।[৩৮] যদিও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে, কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।[৩৯] আবুল কালাম বলেন-

Bangladesh not only a struggle for the emancipation of people: it was struggle for the preservation of democratic human values and rediscovering the cultural soul

Dhaka University Institutional Repository

which were trampled under foot by undesired militrary authoritarianism which successively imposed itself upon a halpless people.[40]

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা

সাধারণত দুধরণের প্রেক্ষাপটে বাইরের শক্তি বিশ্বের কোনো এক অঞ্চলে কোন সমস্যা বা সঙ্কটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। **প্রথমতঃ** বাইরের শক্তির কাছে অঞ্চলটি ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য যখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়। **দ্বিতীয়তঃ** এমনি তাৎপর্যের পাশাপাশি যদি সঙ্কটকালে সেই বিশেষ অঞ্চলের দেশ/দেশসমূহ বাইরের শক্তিকে সমস্যা/সঙ্কট সমাধানের জন্য বা কোন এক পক্ষের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।[৪১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পাকিস্তানের স্বার্থকে প্রধান্য দিয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তান সরকার তাদের অপশাসন শোষণ ও দুর্নীতির কথা চেপে গিয়ে ইসলাম ও মুসলমানের জিকির তুলে পুরো মুসলিম বিশ্বকে ধোকা দিয়েছিল। বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়- প্রধানত এই মনোবৃত্তি ও যুক্তি থেকে বৈরিতার সূত্রপাত ঘটে।[৪২] এতদসত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের ব্যাপারে একই ধরনের নীতি গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ বিপক্ষ অবস্থানের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলো তিন শ্রেণিতে বিভক্ত দৃশ্যমান হয়।

প্রতিক্রিয়াশীল দেশঃ এ দেশগুলোর মাঝে অন্যতম হল সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, জর্ডান , আরব আমিরাত, মরক্কো ও গাম্বিয়া।

মধ্যপন্থি দেশঃ এ দেশগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল আলজেরিয়া, তৎকালীন দক্ষিণ ইয়ামেন, সুদান লেবানন, আফগানিস্তান, মিশর, ইরাক, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া।

মৌন দেশঃ কিছু মুসলিম দেশ ছিল যারা অভ্যন্তরীণ সংকটও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব না থাকার কারণে কোন পক্ষই অবলম্বন করেনি। [৪৩]

প্রতিক্রিয়াশীল ধারার দেশ হিসেবে ইরান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে বাংলাদেশকে ভারতের পক্ষ মনে করে প্রথম থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানকে নৈতিক, আর্থিক, অস্ত্র সহযোগিতা এবং জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরানের পাকিস্তান নীতি গ্রহণের মূল কারণ এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হল।

ইরান ও পাকিস্তানের জাতিগত, ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। ইরান তার নিজস্ব রাজনীতি, জাতিগত সংকট ও উপসাগরীয় এলাকায় নিজস্ব প্রাধান্য বিবেচনায় পাকিস্তানকে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে কামনা করছিল। এ প্রেক্ষাপটে ইরান পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরান পাকিস্তানকে সমর্থন করার কারণগুলো নিম্নরূপ-

> রাজতন্ত্রশাসিত ইরানে একদিকে পার্লামেন্ট মজলিশ থাকলেও ১৯২১ সাল থেকে রেজা শাহ পাহলভির একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলছিল। পাকিস্তানের প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিজেকে আর্য বংশোদ্ভূত এবং ইরান থেকে আগত ঘোষণা দুদেশের স্বৈরাচারী শাসককে কাছাকাছি এনে দেয়।[৪৪]

ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে সকল ইস্যুতে ভারতের প্রতি পাকিস্তানের নীতিকে ইরান সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের প্রবাসী মুজিব নগর সরকারের সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বক্তব্য এবং ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদে কমিউনিস্ট পন্থিদের প্রাধান্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইরানকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। ১৯৪৭ এবং ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ইরান পাকিস্তানকে এ কারণেই সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ইরান পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়। পাখতুনিস্তান আন্দোলন দমনের জন্য ইরান ও পাকিস্তানের অভিন্ন নীতি রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বেলুচিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রভাবে ইরানি বেলুচদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও ইরানকে অস্থিতিশীল করে তোলার ভয় ইরানকে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনে প্ররোচিত করে। ইরান রাজতন্ত্র শাসিত এবং পাকিস্তান সেনা শাসিত দেশ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ায় উভয় দেশের শাসন ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই উভয় দেশকে এক কাতারে নিয়ে আসে।

ইরান ও ইরাকের মধ্যে সীমান্ত ও আন্তঃসম্পর্কে সমস্যা থাকার কারণে ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাকের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক জড়িত ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত মিত্র ইরাকের সহানুভূতি এবং উপসাগরীয় এলাকায় রুশ আধিপত্যের সুযোগে ইরাকের অবস্থান ইরান মেনে নিতে পারেনি।

১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় মধ্যপ্রাচ্য সহ আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোতে চীনের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট ইরান চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।[৪৫] ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে চীন জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করার ফলে চীনের পাশাপাশি অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভারতের প্রতি সমর্থন ও আগস্ট মাসে রুশ-ভারত চুক্তি, ইরান ভারত মহাসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার আধিপত্য বিবেচনা করে পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি ইসরাঈলের সমর্থন ইরানের পাকিস্তান-নীতি গ্রহণের পেছনে অন্যতম ভূমিকা রাখে। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের জন্য ইসরাঈলি রেডক্রস কাপড় ও খাদ্য পাঠানোর ঘোষণা দেয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাহায্য প্রত্যাখান করলেও পাকিস্তান বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের বিরুদ্ধে ইসরাঈলি সমর্থনের অপপ্রচার চালায়।

ইরান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করার ঐতিহাসিক কারণ খুজতে গেলে প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চাশের দশকে ইরানের তেল জাতীয়করণের আন্দোলন, প্যালেস্টাইন সমস্যা, সুয়েজ সংকট, জামাল আব্দুন নাসেরের নেতৃত্বে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান প্রভৃতি বিষয়সমূহ মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে পাশ্চাত্য দুনিয়া ও আমেরিকাকে ভাবিয়ে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত ঘেঁষে সামরিক জোট সৃষ্টির জন্য বাগদাদ

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক চুক্তি ও পরিকল্পনা গৃহিত হয়। এ নীল নকশা বাস্তবায়নে পাকিস্তান অগ্রণি ভূমিকা পালন করলেও তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান (বাংলাদেশ) প্রতিবাদ করে।[৪৬]

ইসলামের নামে আর কখনো এতোগুলো ইসলামি রাষ্ট্র (পাকিস্তান, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি) ক্ষুদ্র একটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এতো মুসলমান হত্যার ঘটনা আগে কখনো ঘটায়নি।[৪৭] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইরান সরকার প্রথম দিকে বিবৃতি প্রদান পূর্বক সরকারিভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর গণহত্যার পর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের প্রধান দেশগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করে পাকিস্তানের সমর্থনে বিবৃতি প্রদান করে। ইরান প্রথম থেকেই পাকিস্তানের সহায়ক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন দেশের হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানিয়ে ইরান ২৮ মার্চ বিবৃতি দেয়। পরের মাসেও ইরান সরকার একই নীতিতে অটল থাকে। এপ্রিল মাসের শেষে সিয়েটোর (CEANTO) মন্ত্রি পরিষদের পক্ষ থেকে এক যুক্ত ঘোষণায় ইরান ও তুরস্ক পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে রুশ-ভারতীয় হস্তক্ষেপের নিন্দা করে।[৪৮] জুন মাসে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যখন যুদ্ধের ব্যাপকতা লাভ করে তখন ইরানের তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে থাকে। ১৬ জুন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশী জাহেদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করে শাহের বাণী হস্তান্তর করেন। পরদিন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এম খানের দেয়া ভোজ সভায় বক্তৃতাকালে ইরানি মন্ত্রী পাকিস্তান ও ইরানকে একদেশ এবং তাদের স্বার্থ অভিন্ন হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন-আমরা সকল সময় পাকিস্তানি ভাইদের সাথে আছি।[৪৯]

অন্যদিকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে অবহিত করার জন্য প্রথম থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২৬-২৮ মে ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত আবু সাঈদ চৌধুরী ইউ.এস, লিবিয়া, মিশর, জর্ডান, ইরাক, ইরান,

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া, সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। কিন্তু কট্টরপন্থি দেশগুলোর মনোভাব এতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।[৫০] বরং জুনের শেষ সপ্তাহে ও আই সির বৈঠক শেষে যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার পূর্ণ সমর্থন দেয়। এর ফলে জুলাই-আগস্ট মাসে মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানপন্থি নীতিতে আরো কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। জুলাই মাসের শুরুতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জেড. এ ভুট্টোর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল ইরানকে যুদ্ধের পক্ষে আরো সক্রিয় করে তোলার জন্য তেহরান সফর করে।

১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট তেহরান সরকার চীনকে স্বীকৃতি প্রদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তকে অনেকে পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন-চীন কূটনীতির নতুন অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন।[৫১] ৯ আগস্ট রুশ-ভারত চুক্তি ইরান ও পাকিস্তানকে নতুনভাবে ভাবিয়ে তোলে। ইরাকের নিকট হতে নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে উভয় দেশ আরো কাছাকাছি আসে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকের ব্যাপারেও ইরান উদ্যোগী হয়।[৫২] ১২ আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা নূরুল কাদির তেহরানে অবস্থান কালে ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি ও কয়েকটি ছবির এ্যালবাম প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> ১২ সেপ্টেম্বর রবিবার প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোভায়দাকে লেখা আমার চিঠিটি পড়ার পর ও এ্যালবামে বিভৎস সব ছবি দেখার পর ইরানের শাহেনশাহ ইরানের বৈদেশিক নীতিতে রদবদল আনার অভিপ্রায়ে তাৎক্ষণিক ভাবে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীকে দিলেন। ফলে ১৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার প্রধানমন্ত্রী আমীর আব্বাস হোভায়দা তার মন্ত্রিপরিষদ থেকে ইরানের পাকিস্তানপন্থি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশীর জাহেদীকে বাদ দিয়ে তারই ডেপুটি নিরপেক্ষ ও উদারপন্থি আব্বাস আলী খালাতবারিকে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করলেন। ইরানের শাহেনশাহ-এর নির্দেশে পাকিস্তানপন্থি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশীর জাহেদীকে সরিয়ে তার স্থানে তারই ডেপুটি নিরপেক্ষ ও উদারপন্থি আব্বাস আলী খালাতবারিকে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করায় ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

বৈদেশিক নীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করলো, যা বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনলো।[৫৩]

১৪ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজতন্ত্রের ২৫০০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২ দিনের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান তেহরানে ঝটিকা সফর করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজ প্রাসাদে পৌছে ইরানের শাহেনশাহ মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভির সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে নিভৃতে 'বাংলাদেশ' ইস্যুতে আলোচনায় মিলিত হন। পর পর দুদিন ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর, বুধবার তারা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তারপর ১৫ সেপ্টেম্বর, কাউকে কিছু না জানিয়ে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তেহরান থেকে ইসলামাবাদে ফিরে আসেন।[৫৪]

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এই ভয়াবহ সংকটের সময়ে তাঁর এ সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইরানের মধ্যস্থতায় ভারতের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো। হেনরি কিসিঞ্জারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও একটি সমঝোতার উদ্যোগ নেয়া হয়। মার্কিন ও ইরানি এ উদ্যোগ সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও সজাগ ছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদ সাপ্তাহিক জয়বাংলার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সমঝোতার সুস্পষ্ট চারটি শর্ত উল্লেখ করেন-

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি।

২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি।

৩. বাংলাদেশ থেকে সকল পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার।

৪. বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসলীলার ক্ষতিপূরণ প্রদান।[৫৫] যদিও মুজিব নগর সরকার ও ভারত এ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ না দেখানোর কারণে এ বিষয়টিতে তেমন অগ্রগতি হয়নি।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সফরের ফলে পাক-ইরান সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়। ইয়াহিয়া খান এক জাঁকজমক অনুষ্ঠানে ইরানের ১০ বছর বয়স্ক যুবরাজ মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

রেজা খানকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ফ্রন্টিয়ার কোরের প্রথম কর্নেল ইন চিফ পদে অভিষিক্ত করেন। ইয়াহিয়া খান তার বক্তৃতায় রেজা খানকে তার কর্নেল ইন চিফ হিসেবে পেয়ে পাকিস্তান গৌরব বোধ করেছে বলে মন্তব্যে তার ইরান তোষণনীতির প্রতিফলন ঘটায়।[৫৬] শাহের পাকিস্তান প্রীতির আরো প্রমাণ পাওয়া যায় প্যারিস ভিত্তিক Le Figuro পত্রিকায় ২৮ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাতকার থেকে। তিনি এতে বলেন-

Iran was 100 percent behind Pakistan in East Bengal crisis. It is normal. We (Shah and Yahya) are very close personally and without trying to the racist our two people are of Aryan origin united further by Islam.[৫৭]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে অক্টোবর মাসে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী ৫২টি ফ্যন্টম বিমান পাকিস্তানকে বৈমানিক সহ সরবরাহ করে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র রবার্ট মেকলসকি এর সত্যতা স্বীকার করেন। পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিন জার্নালিস্ট জ্যাক এন্ডারসন বলেন-জর্দান এবং অপরাপর কতিপয় আরব রাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানকে মার্কিন বিমান সরবরাহ করা হয়েছিল।[৫৮] এন্ডারসন ১৯৭১ সালের যুদ্ধে মার্কিন সরকারের ইরান, জর্ডান, লিবিয়া, সৌদি আরবের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের গোপন তথ্যটি ফাঁস করে দেন। ইরানের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের একটি প্রামানিক আলোচনা করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নূরুল কাদির বলেন-

> মার্কিন প্রশাসন সিনেটে অনুমোদন না পেয়ে পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র সরবরাহের জন্য ভিন্নপথ খুঁজছিল। এরই অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জ্ঞাতসারে 'তৃতীয় পক্ষে'র মাধ্যমে পাবিস্তানে অস্ত্র ও যুদ্ধবিমান প্রেরণের একটি সক্রিয় তৎপরতা ছিল। এজন্য 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন দুই মিত্ররাষ্ট্র শাহ শাসিত ইরান ও জর্ডানকে। নির্দেশ ছিল, এ দুটি দেশ পাকিস্তানকে বিমান দেবে এবং এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাছে বিমান সরবারাহ করবে। এ তৎপরতার প্রমাণ রয়েছে ৪ ডিসেম্বর ও ১২ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মধ্যে তিনটি টেলিফোন সংলাপে।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

৩ ডিসেম্বর চুড়ান্ত যুদ্ধে পাকিস্তান এ যুদ্ধবিমানগুলো ব্যবহার করে। যুদ্ধে ইরান পাকিস্তানকে সহায়তা করার জন্য সরাসরি এগিয়ে আসে। পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণের প্রধান টার্গেট ছিল করাচির তেল ডিপোগুলো। এ সময় ইরান পাক বিমানগুলোর পাহারার দায়িত্ব নেয়। যে কোন প্রয়োজনে ইরানের বিমানঘাঁটিগুলো ব্যবহার এবং পাকিস্তান বিমানের প্রয়োজনীয় যেকোন রসদ সরবরাহ করতে ইরান সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। করাচি বন্দর আক্রমণের শিকার হলে ইরান জাহেদান সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করে। অক্টোবরে মার্কিন বিমান ছাড়াও ইরানের মাধ্যমে পশ্চিম জার্মানি পাকিস্তানকে দেয় ৯০ টি এফ ৮৬ স্যাবর জেট, ৬ টি আলুম এ-হেলিকপ্টার, ২৪ টি মিরাজ, ৩ টি ফাইটার, ৩ টি ডুবো জাহাজ। ইরান নিজে দেয় ২৪ টি লকহীড সি ১৩০ হাকিলাস পরিবহন বিমান।[৬০]

পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান অস্ত্র ছাড়াও জাতিসংঘে সমর্থন আদায়ের ব্যবস্থা নেয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিলে ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধ বিরতি বিষয় উপস্থাপিত হয়। ঐদিন আলোচনাকালে লেবানন, জর্ডান, ইরান, সৌদি আরব পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর জোর দেয় এবং যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে। যুদ্ধ বিরতির মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ইরান সহ সকল মুসলিম দেশ ভোট দেয়।[৬১] ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ইরানের ভূমিকা সারণির মাধ্যমে দেখানো হল-

দেশ	সমস্যার উল্লেখ	সমস্যার রাজনৈতিক ও মানবিক দিক উভয় সম্পর্কে উল্লেখ	শুধু মানবিক বিষয়ে নজর দেয়ার কথা	পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়	গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন
ইরান	*	*		*	

সূত্র: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষেদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনের দলিলপত্র বিশ্লেষণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে ২২ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) জেদ্দা অধিবেশনে- চরম সংকটকালে পাকিস্তানের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্যেও ইরান ইচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ, ইসলামি সংহতি রক্ষার জন্যে তা ছিল জেহাদের মত নৈতিক কর্তব্য।[৬৩]

ইরানের পাকিস্তানপন্থি নীতি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। ইরান ১৯ আগস্ট ১৯৭৫ সালে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর মহাবিস্ময়কর এক ইতিহাসের নাম হলো ইরানের ইসলামী বিপ্লব। যার নেতৃত্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ উযমা সাইয়েদ রূহুল্লাহ্ খোমেইনী (রহ্.) [পরে যিনি হযরত ইমাম খোমেইনী হিসেবে বিশ্বব্যাপি পরিচিতি হন।][৬৫] পাহলভি রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা রেজা শাহ পাহলভি তার স্বেচ্ছাচারিতা ও আমেরিকা তোষণ নীতির বিরোধীতা করার কারণে ধর্মীয় আলেমদের ওপর জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছিলেন। এর ফলে আলেম সমাজের নেতৃত্বে ইরানের সাধারণ জনগণের মাঝে ক্ষোভ দানা বেধে উঠলে শাহ এ আন্দোলনকে মুলোৎপাটন করার পরিকল্পনা করেন। Frank cass বলেন-

> The victory of the tobbaco revolt brought the bazar and the ulama closed together and created a powerful soladarity group armed with both financial resources and the Ideology which proved critical in future conflicts, mainly the constitutional and the revolution of 1979.[66]

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৩ সালে শাহের শাভাক বাহিনী ইমাম খোমেইনীকে তার শাহ বিরোধী বক্তব্যের জন্য আটক করে।[৬৭] কিন্তু জনগণের প্রতিবাদের মুখে কিছুদিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। উক্ত বছরের মহররম মাসে আশুরার দিন খোমেইনীর শাহ বিরোধী বক্তব্যের জন্য সরকার পুনরায় তাঁকে আটক করে। ১৯৬৪ সালে তিনি কারাগার হতে মুক্তি পান। ১৯৬৪ সালের ৪ নভেম্বর শাহের সেনারা কোম ঘেরাও করে আবারও ইমাম খোমেইনীকে গ্রেফতার করে সরাসরি মেহরাবাদ বিমান বন্দরে নিয়ে যান এবং তুরস্কের ইজমিরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়।[৬৮] প্রায় এক বছর পর ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ইমামকে তুরস্ক থেকে ইরাকের নাজাফে পাঠানো হয়।[৬৯] ইরাকের নাজাফে অবস্থান কালে তিনি ইরানি জনসাধারণের প্রতি ইসলামের নির্দেশিকা পাঠিয়ে ও ইসলাম বিরোধী সরকারের সমালোচনা করে ইরানি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। এ অবস্থায় ইরাক সরকারের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি অনন্যোপায় হয়ে ইরাক ত্যাগ করে কুয়েতে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে কুয়েত সরকার তাঁর কুয়েতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অগত্যা

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইমাম ফ্রান্সে গমন করেন। ফ্রান্সে পৌঁছে তিনি প্যারিসের উপকণ্ঠে 'নওফেল লু শ্যাতে' নামে এক পল্লীতে বসবাস শুরু করলেন।[৭০] ফ্রান্সে অবস্থানকালে ফরাসী সরকার তার রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ফ্রান্সের ঐ বাড়িটি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী ইরানি, ইরানের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো ইমামের সাথে পূর্বের চেয়ে আরো বেশী দেখা সাক্ষাত ও সংবাদ প্রচারের সুযোগ লাভ করে। এতে ইসলামের দিক-নির্দেশনা দান, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রচার ও প্রসারে ইমামের কর্মতৎপরতায় ভিন্নমাত্রা যোগ হয়। ইমামের দেশত্যাগের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ইরানের সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল হোসেইন ফেরদৌস বলেন-

> শাহ'র সাথে ইরাকের সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার আর একারণেই তিনি ভাবেন, ইমাম খোমেনীকে নির্বাসনে পাঠালে তাঁর "গদি" কোনভাবেই হুমকির সম্মুখীন হবেনা। কুয়েত ইমাম খোমেনীকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এর ফলে তাকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। খোমেনীকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়ে শাহ নিশ্চিত হন যে তার সামনে আর কোন হুমকি আসন্ন নেই এবং ইমাম খোমেনীর তৎপরতা তিনি মার্কিন সহায়তায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এদিকে নিজ দেশে শাহ মার্কিন এবং ব্রিটিশদের পরামর্শে হাজার হাজার কাগজপত্র পূর্ণবিবেচনার মাধ্যমে ক্ষিপ্ত জনমতকে প্রশমিত করার প্রয়াস নেন। সরকারি কর্মকর্তারা শাহ'র নির্দেশ পালন করেন কিন্তু এর ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু জনরোষ প্রশমিত হয়নি।[৭১]

এছাড়াও শাহের প্রতিষ্ঠিত শাভাক বাহিনীর অত্যাচারে সাধারণ জনগণ ছিল বিপর্যস্ত। তার এ বাহিনীর অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে Suroosh Irfani বলেন-

> It was in view of the torture metal out to members of guerrilla organizations often leading to their death, and their sumary trails, often ending up in execution, that in 1975 Amnesty International credited the Shah's regime with `The highest rate of death penalties in the world and a history of torture which is beyond belief.[72]

Dhaka University Institutional Repository

শাহের অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, আন্দোলনের কর্মসূচি পালনের ব্যাপারে বামপন্থি ও ডানপন্থির কোন বিভেদ ছিলনা। ইরানের সকল জনগণ সকল প্রকার বিভেদ ভুলে গিয়ে শাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান ইতিহাসবিদ John D. Stempel *Inside The Iranian Revolution,* গ্রন্থেবলেন-

> Two primary themes form the basis of Iranian Revolutionary political passions and action-anti Shah and anti-Modernization, as well as anti-Western sentiment amounting to hatred. These issues unite the Marxist left and the religious fundamentalist right.[৭৩]

ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর আন্দোলনের সফলতা দেখতে পেয়ে শাহ ও তার কতিপয় বুদ্ধিজীবী ইমামের চরিত্রে আঘাত হানে। এমনকি তাকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলেও আক্ষা দেয়া হয়। তাদের এসকল অপতৎপরতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হামিদ আলগার বলেন-

> যে একটা ভুল শাহের পতনের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল এবং এ পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল তা ছিল এমন এক নির্বোধের কাজ যা একজন মুসলমান খোদায়ী পরিকল্পনা বলে ভাবতে পারে। আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে অত্যন্ত অশ্লীল ও বিভৎস ভাষায় গালাগালি দিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। প্রেসিডেন্ট কার্টারের তেহরান সফরের পর পরই সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্র পত্রিকায় এগুলো ছাপানো হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে দাবী করা হয় যে, আয়াতুল্লাহ খোমেনী যৌন পদস্খলনের অপরাধে অপরাধী, তিনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোক এবং তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার দালাল।[৭৪]

৮ অক্টোবর, ১৯৭৮ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইরানের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের ছাত্রছাত্রীদের সম্বোধন করে একটি সুদীর্ঘ বাণী প্রেরণ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইসলাম বিদ্বেষী ভাব, পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ ও শাহ বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে সাড়া না দেয়ার আহ্বান জানান। বাণীর উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল নিম্নরূপ-

> আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের পরিবেশে সচেতনভাবে ও নিষ্ঠার সাথে উত্থান কর ও পরস্পরের সাথে যোগদান কর এবং ইসলামের ও দেশের মুক্তির জন্য চেষ্টা কর। আর সর্বাগ্রে ইসলামের দেয়া পবিত্র হুকুম-আহ্কামের অনুসরণ কর, কারণ এসব আহ্কাম হচ্ছে জাতিসমূহের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা প্রদানকারী। আর যেসব উপদল বিজাতীয়দের প্রচারণার ফলে প্রতারিত হয়েছে, বিভিন্ন মতাদর্শকে গ্রহণ করেছে ও সে-সবের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তাদেরকে দুশমনের প্রতারণা ও অপকৌশল সম্বন্ধে সচেতন কর এবং বিকৃত মতাদর্শসমূহের প্রতারক-নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দাও। দেশকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে অনৈক্য ও বিভেদ থেকে কঠোরভাবে দূরে থাক।
>
> ইরানের সন্তানগণ! আমাদের মহান জাতি শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি কোনভাবেই ঝুঁকে পড়তে চায় না। আর এ কারণেই এ জাতি ডানপন্থী ও বামপন্থী হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে, এ কারণেই আমরা প্রতিদিনই তাদেরকে দলে দলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হাতে নিহত হতে দেখছি, তোমরা এ জাতির সাথে তোমাদের বন্ধনকে সুদৃঢ়তর কর।[৭৫]

১৯৭৬ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর নির্দেশে ইরানি জনগণ শাহ সরকারের পতনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে তার অন্যতম একটি হল ধর্মঘট। ৮ সেপ্টেম্বর-এর পর সারাদেশে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইসলামি বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ মাস ৩দিন এ ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। এ ধর্মঘটে ব্যবসায়ী, দোকান মালিক, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও পেশাজীবী ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ফলে সমগ্র ইরান ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ে। এসময় শাহের শাভাক বাহিনী ইমামকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু এ পরিকল্পনা কার্যকর করতে শাহ ব্যর্থ হয়। তবে ১৯৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর শাভাকের এজেন্টদের হাতে ইমামের প্রথম পুত্র আয়াতুল্লাহ মোস্তফা খোমেনী শাহাদাত বরণ করেন।[৭৬] তেল নির্ভর অর্থনীতির কারণে ধর্মঘটের প্রভাব উক্ত শিল্পেও লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে তেলশ্রমিকের ধর্মঘট ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মঘটের কারণ দেখিয়ে তেল শ্রমিকরা বিদেশে তেল রফতানি বন্ধ করে দেয়। তেল উত্তোলনের পর্যায় আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এম. এস আর আজহারি দি ইরান ইরাক ওয়ার গ্রন্থে বলেন, যেখানে ইরান ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে দৈনিক ৫৮৪৮ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলন করত সেখানে জানুয়ারি মাসে তেল উত্তোলনের মাত্রা ৩০০০ হাজার ব্যারেলে এসে পৌছে।[৭৭] শিল্প-কারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘটে যোগদান করায় শাহী সরকারের মেরুদণ্ডে বিরাট আঘাত পড়ে।[৭৮]

দক্ষ রাজনীতিবিদ ইরানের প্রধানমন্ত্রী শরীফ ইমামি জনরোষ প্রশমিত করার আশায় মদ্যশালা ও জুয়াখানাগুলো বন্ধের নির্দেশ দেন, রাজকীয় ক্যালেন্ডারকে হিজরি ক্যালেন্ডারে পরিবর্তন করেন এবং বেতন বৃদ্ধি করেন। কিন্তু শরীফ ইমামির প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।[৭৯] ১৯৭৮ সালের ৪ নভেম্বর ছিল ইমাম খোমেইনীকে ইরান থেকে তুরস্কে নির্বাসিত করার স্মরণ বার্ষিকী। ৪ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে ইমাম খোমেইনীকে ইরান থেকে তুরস্কে নির্বাসিত করা উপলক্ষ্যে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে ছাত্র জনতা কর্তৃক শাহী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে দুপুরের দিকে হঠাৎ করে সশস্ত্র বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। সৈন্যদের গুলীতে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের রেশ ধরে সমগ্র তেহরান শহরে বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা ছড়িয়ে পড়ে। এ নাশকতা দমন করতে না পারার কারণে শাহ সরকার শরীফ ইমামিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরদিন শরীফ ইমামি পদত্যাগ করেন এবং শাহী সরকারের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল আয্হারীকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। সরকার পরিবর্তনের এ ভূমিকায় আমেরিকার নেপথ্য হাত থাকার উল্লখ করে H.E. Chehabi বলেন-

> In November violence and economic dislocation intensified, and the conditions approached civil war. The new situation was reflected in the contents of U.S ambassador Sullivan's report to Washington, as he became

Dhaka University Institutional Repository

convinced that the time had come for America to start seriously thinking about dealing with post-Shah government.[৮০]

৫ নভেম্বর ১৯৭৮ সালে জেনারেল আয্হারীর ক্ষমতা গ্রহণের পর মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে শাহ্ রেডিও-টেলিভিশনে প্রদত্ত বিনম্র ভাষণে দেশবাসী ও আলেম সমাজের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি শুধু বাদশাহ পদবী ধরে রাখবেন, রাষ্ট্র চালাবেন না, এ জন্য তিনি জনগণের নিকট 'অনুমতি প্রার্থনা' করেন।[৮১]

মুহর্রম মাস শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইরানী জনগণের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় জিহাদী উদ্দেপনামূলক বাণী প্রেরণ করেন। উক্ত বাণীতে তিনি বলেন -

> মুহর্রম মাসের আগমনে গৌরবগাথা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মাস শুরু হলো, যে মাসে তলোয়ারের ওপরে রুধিরের বিজয় ঘটে, যে মাসে সত্যের শক্তি বাতিলকে চিরদিনের জন্য নিন্দিত করে দিয়েছে, জালেম-অত্যাচারীদের জোট ও শয়তানী হুকুমসমূহের ওপর বাতিলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যে মাস সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বর্শাফলকের ওপরে বিজয়ী হবার পথ শিক্ষা দিয়েছে, যে মাস সত্যের কলেমার মোকাবিলায় পরাশক্তিবর্গের পরাজয়কে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে, যে মাসে মুসলমানদের ইমাম (হোসেইন রা.) আমাদেরকে ইতিহাসের জালেম-নিপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন।
>
> এখন তো মুহর্রম মাস ইসলামের সৈনিকদের, মহান ওলামায়ে কেরামের, সম্মানিত খতীবদের এবং সাইয়্যেদুশ্ শূহাদা ইমাম হোসেন আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্-সালামের (অনুসারী) মহান মর্যাদাবান শিয়াগণের হাতে এক খোদায়ী তলোয়ারের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, তাই তাঁরা যেন সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন।[৮২]

ইসলামি বিপ্লব সমন্বয়ের জন্য তিনি সকল আলেম, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে গণ-সংযোগ করার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন-

> দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্রসমূহের যেসব ছাত্র ও মহান আলেম এ দিনগুলোতে জনগণকে সচেতন করার জন্য গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে গমন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে বঞ্চিত ও সম্মানিত গ্রামবাসী চাষীদেরকে শাহের পৈশাচিক কার্যকলাপ ও নিরীহ লোকদের হত্যা সম্পর্কে সচেতন

Dhaka University Institutional Repository

করে তোলা।... এটা আর স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, (ইমাম হোসেনের স্মরণে) শোকসভার আয়োজন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে হতে হবে, তা যেন শাহের পুলিশ বা নাশকতাবাদী তথাকথিত নিরাপত্তা বাহিনীর অনুমতি সাপেক্ষ না হয়। প্রিয় দেশবাসী! আপনারা কর্মকর্তাদের নিকট (অনুমতির জন্য) না গিয়েই (শোক) মজলিসের আয়োজন করুন। এতে বাধা দেয়া হলে আপনারা মাঠে ময়দানে, চৌরাস্তায়, রাস্তার ওপরে ও গলিতে গলিতে সমাবেশ করুন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিপদ-মুছিবত এবং শাহী সরকারের দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিন।

ইরানের মহান জনগণ ইসলামী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে শাহ্ ও তার ধামাধরাদের মুখে শক্তিশালী মুষ্ঠাঘাত হেনেছেন, আমি তাদের প্রতি আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি সত্যের রাস্তায় ও খোদায়ী লক্ষ্যে শাহাদাত বরণকে গৌরব এবং অমরত্ব লাভ বলে মনে করি। যে সব তরুণ ইসলামের রাস্তায় ও মুক্তির চেতানায় রক্তদান করেছে আমি তাদের পিতা-মাতাদেরকে মোবারকবাদ জানাই। যে সব প্রিয় ও বীর তরুণ প্রিয়ের (আল্লাহর) পথে জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়। ইরানের মহান ইসলামি বিপ্লবের আওয়াজ মুসলিম দেশসমূহে ও অন্যান্য দেশে অনুরণিত হচ্ছে ও গৌরববোধ সৃষ্টি করছে। প্রিয় ও সম্মানিত দেশবাসী! আপনারা মুসলিম জাতিসমূহের বীর তরুণদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আশা করা যায় যে, আপনাদের সক্ষম হাতে ইসলামী শাসনের গৌরবময় পতাকা সকল প্রান্তেই উড্ডীন হবে। আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমার এটাই প্রার্থনা।[৮৩]

জেনারেল আয্হারী ক্ষমতা গ্রহণ করার পরও কড়া সামরিক শাসন এবং সান্ধ্য আইন কোন কিছুই ইরানের জনসাধারণকে ইসলামি বিপ্লবের আন্দোলন থেকে দূরে সরাতে পারেনি। ৫ জুন ১৯৬৩ সালে আশুরার দুদিন পর সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। দীর্ঘ পনের বছর পর এবারও আশুরার সময় এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, গোটা জাতি 'প্রতিদিনই আশুরা' 'প্রতিটি ভূখণ্ডই কারবালা' স্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষোভের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আশুরার দিন ব্যাপকহারে বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ দিন ৫০-৬০ লাখ লোকের এক বিক্ষুব্ধ মিছিল তেহরানের উত্তর এলাকার দিকে ধাবিত হয়।[৮৪] এ মিছিলের দৈর্ঘ্য ছিল ১২ কিলোমিটারেরও বেশী। সেদিন সকলে সমস্বরে 'আল্লাহু আকবর, খোমেইনী

Dhaka University Institutional Repository

রাহ্‌বার', 'স্বাধীনতা, মুক্তি, ইসলামী হুকুমত', 'শাহ নিপাত যাক', 'না প্রাচ্য, না পাশ্চাত্য, ইসলামী হুকুমত' শ্লোগান সহকারে রাস্তায় নেমে আসে।[৮৫]

১২ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইরানি জনগণের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে বলেন-

> আমি আপনাদের এ বিশাল মিছিলের সমসময়ে বিশ্বের সরকার প্রধানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বাণীতে ঘোষণা করছি যে, এ দিনের রেফারেন্ডাম কারো নিকটই এ বিষয়টি অস্পষ্ট রাখেনি যে, (ইরানী) জাতি শাহ কে চাচ্ছে না এবং প্রায় সর্বসম্মতভাবে জনগণ তার প্রতি স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে। এ কারণে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি যে, অতঃপর যেসব দেশের সরকার বা সরকার প্রধান শাহকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে, সেসব দেশকে ইরানের তেল থেকে বঞ্চিত হতে হবে; তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের অবৈধ ঘোষণা করা হলো।
>
> তেমনি তরুণ অফিসারদের জন্যও এ মর্মে বাণী পাঠিয়েছি যে, তাঁরা যেন জনগণের কাতারে যোগদান করেন। কারণ আমরা তাঁদেরকে (বিদেশী) সামরিক উপদেষ্টাদের অধীনতা থেকে মুক্তি দেব এবং উন্মুক্ত বক্ষে টেনে নিব। সম্মানিত জনগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, যে সব সৈনিক ও অফিসার তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁদেরকে সর্বোতভাবে এবং তাদের নিরাপত্তার সংরক্ষণ সহকারে দেখাশোনা ও সাহায্য করুন।[৮৬]

আশুরার বিক্ষোভ মিছিলের পর ইরানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমেরিকার নিকট তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রথমতঃ আয্‌হারীর সামরিক সরকার কোন কাজে আসবে না।

দ্বিতীয়তঃ ইরানের জনগণের মধ্যে ইমাম খোমেইনীর আনুগত্য এতটাই প্রগাঢ় হয়েছে যে, কোনরূপ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাদের দমানো যাবে না।

তৃতীয়তঃ শাহের পক্ষে ইরান শাসন করা আর সম্ভব নয়, তাই অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা দরকার। For the Shah the crisis had reached the stage of Shah maat (checkmate).[87]

Dhaka University Institutional Repository

৫ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে শান্তিপূর্ণভাবে শাহকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আমেরিকা নতুন পরিকল্পনা করে। এ পরিকল্পনাটি ছিল জাতীয়তাবাদী একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করা। শাপুর বখতিয়ার এক সময় জেবহেয়ে মিল্লী (ন্যাশনাল ফ্রন্ট)- এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা থাকায় এ পরিচয়কে জাতির সামনে উপস্থাপনপূর্বক তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়। শাপুর বখতিয়ারকে ক্ষমতায় বসানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে John D. Stempel, *Inside The Iranian Revolution* গ্রন্থে বলেন-

> U.S policy focused on Bakhtiar as the last chance for a constitutional (nonviolent) solution to the crisis. After the installation of Bakhtiar, Washington directed Ambassador Sullivan to inform the Shah that the United States belived it would be wise for him to leave the country temporarily.[৮৮]

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে তিনি তার মাথার ওপর ইরানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা ড. মোসাদ্দেকের ছবি টানিয়ে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রদান করেন শাহ্ দেশ থেকে চলে যাবেন, তাঁর শাসন হবে গণতান্ত্রিক ও সংবিধান ভিত্তিক, ইসলামের হুকুম-আহকাম ও রীতি নীতি ফিরিয়ে দেয়া হবে, (সাবেক প্রাধানমন্ত্রী হোভায়দা ও সাভাকের সাবেক প্রধান নাছিরীসহ যারা তখন কারাগারে ছিলেন) সাবেক আমলের সকল অপরাধী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও লুণ্ঠনকারীদের বিচারের আওতায় আনা হবে, বন্ধ হয়ে যাওয়া সংবাদপত্রসমূহ (যা আযহারীর সময় প্রকাশিত হত না) স্বাধীনতা লাভ করবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতা অবাধ হবে, রাজনৈতিক বন্দীদের সর্বশেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মুক্তি দেয়া হবে।[৮৯] এ ছাড়াও ইরানের সাথে হেলিকপ্টার তৈরির ব্যাপারে মার্কিন প্রতিষ্ঠান 'টেক্সট্রনের' সাথে ৫৭ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলারের চুক্তি বাতিল করে।[৯০] বখতিয়ার আশা করেন, তাহার শাসনামলে ইরানে সামাজিক গণতন্ত্র কায়েম হবে।[৯১]

ইমাম খোমেইনী (রহ.) তাৎক্ষণিক ভাবে বখতিয়ারের সরকারকে বেআইনি ঘোষণা করেন। বখতিয়ার ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর সরকার গঠনের এ প্রক্রিয়াকে ব্যাপক তিরস্কার করেন। তার এ আচরণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে সরুশ ইরফানি বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

> On 5 February, four days after his arrival, Khomeini appointed Mehdi Bazargan Prime minister of the provisional Government. Bakhtiar called this move a `joke' saying that he would take no action as long as it remained a joke. With a crumbling army and an indecisive America behind him, Bakhtiar still belived himself to be the legal Prime minister of the country.[92]

বখতিয়ার সরকারও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হল। সমগ্র ইরান জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও হত্যাযজ্ঞের লীলাভূমিতে পরিণত হল। ইরানের সাধারণ জনগণ শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলে বলে উঠলো 'না শাহকে চাই, না শাহপুরকে' এবং 'বখতিয়ার, নওকরে বি-এখ্তিয়ার (ক্ষমতাহীন গোলাম)'।[৯৩] Bakhtiar was seem by all sides as an obstacle to the final victory.[94]

১৩ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ইসলামি বিপ্লবী পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করে ইমাম একটি বাণী পাঠান। এ বাণীর এক স্থানে তিনি বলেন -

> ইরানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আমার প্রতি যে আস্থা জ্ঞাপন রায় প্রদান করেছেন তদানুযায়ী শরয়ী অধিকারে জাতির ইসলামী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আমি উপযুক্ত, দ্বীনদার, নিষ্ঠাবান ও নির্ভরযোগ্য লোকদের নিয়ে অস্থায়ীভাবে ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করেছি যা তার কাজ শুরু করবে। এ পরিষদের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তার দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করা এবং এ জন্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। যখনি সঙ্গত ও সময় যথাযথ বলে বিবেচিত হবে তখনই জাতির সামনে অস্থায়ী সরকার উপস্থাপন করা হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে।[৯৫]

১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি শাহ তেহরান ত্যাগ করেন।[৯৬] দেশ ত্যাগের পূর্বে শাহ একটি রাজকীয় পরিষদ গঠন করে উক্ত পরিষদের হাতে অস্থায়ীভাবে শাহী ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বস্তুত শাহের দেশ থেকে পলায়ন ছিল জনগণের বিজয়ের পথে প্রথম পদক্ষেপ। শাহের ইরান ত্যাগের প্রাক্কালে ইরান হতে প্রচুর অর্থ আমেরিকায় হস্তান্তর করা হয়। শাহ ৫০

Dhaka University Institutional Repository

হতে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার আমেরিকায় হস্তান্তর করেছে। জুরিখ ব্যাংকের মাধ্যমে এ অর্থ হস্তান্তরিত হয়।[৯৭] নির্বাসিত ইরানি মুসলিম ধর্মীয় নেতা ইমাম খোমেনী বলেন- আমরা শাহের সিংহাসন ত্যাগ চাইনা, দেশ ত্যাগও নয়। ইরানি জনগণের যে ক্ষতি তিনি করেছেন সেজন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে।[৯৮] তার দেশত্যাগের প্রস্তুতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মনজুরুল আলম খান বলেন-

> শাহানশাহ ইরান ত্যাগের পূর্বে দেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৩ জানুয়ারিতে একটি 'রিজেন্সি কাউন্সিল' গঠন করে যান। শাহপুর বখতিয়ার সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা করাই এ রিজেন্সি কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, সংসদের উভয় পরিষদের চেয়ারম্যানদ্বয়, দরবার মন্ত্রী এবং অন্য দুইজন বিশিষ্ট ইরানি নাগরিককে নিয়ে রিজেন্সি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু রিজেন্সি কাউন্সিল বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বরঞ্চ ২২ জানুয়ারি রিজেন্সি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলাদিন প্যারিসের উপকণ্ঠে আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর খানকায় উপস্থিত হয়ে তার পদত্যাগ পত্র পেশ করে খোমেইনীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। [৯৯]

শাহের দেশত্যাগের মাধ্যমে দীর্ঘ আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান এবং ইরানে পাহলভি শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী ইসলামি বিপ্লবের মহান রাহবার নিজ দেশে ফিরে এলেন। তার সাথে ছিলেন ৫০ জন উপদেষ্ঠা ও ১৫০ জন সাংবাদিক।[১০০] জনগণ ইমামের জন্য নযিরবিহীন অভ্যর্থনার আয়োজন করে। Parviz Daneshvar বলেন-

> Khomeini's return as A Prophet returns to its own land with honour' Stating how millions of people roared their devotation and sought to catch a glimpse of the divine who, after arriving in an Air France jet, rode in triumph through the streets.[101]

তেহরানের মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এরপর তিনি শহিদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে সরাসরি তেহরানের দক্ষিণ উপকণ্ঠে 'বেহেশতে যাহ্‌রা' চলে যান। সেখানে তিনি সমবেত জনতার মহাসমুদ্রের

Dhaka University Institutional Repository

সামনে প্রদত্ত ভাষণে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন- আমি সরকার নিয়োগ করবো, আমি এ সরকারের (বখতিয়ার সরকারের) মুখে মুষ্ঠাঘাত করবো জনগণের সমর্থন নিয়ে এবং জনগণ আমাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে সেই শক্তির বলে আমি একটি সরকারকে নিয়োগ প্রদান করবো।[১০২] ইমামের এ বিজয়ের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মঞ্জুরুল আলম খান বলেন-

> শাহ আমলে ইরানের বিভিন্ন আয়াতুল্লাহও তার গণবিরোধী কাজের সমালোচনা করেছেন।দর তাঁমেধ্যে খোমেনী ছাড়া আয়াতুল্লাহ তেলেঘানি ও আয়াতুল্লাহ মাদরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের সাথে ডা: করিম সাঞ্জাবি, ডা: মেহদী বাযারগান ও অন্যান্য নেতার অবদান ও কম নয়। পরিস্থিতি যখন প্রস্তুত ছিল খোমেনীর বিপ্লবী ভূমিকা একে প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। সে বিপ্লবের অগ্নি শিখা শাহকে যখন দগ্ধ করতে চায়, তখন তিনি দেশত্যাগ করে খোমেনীর বিপ্লবের চুড়ান্ত বিজয়ের পথ সুগম করে দিতে বাধ্য হন। খোমেনীর ইসলামি বিপ্লব কোন দেশের আদর্শ থেকে ধার করা নয় (মুসলিম অথবা সমাজতান্ত্রিক দেশ)। নিজের দেশের পটভূমিতে ইসলামের আইন প্রয়োগে ইরানিদের দ্বারা ইরানের সার্বভৌমত্ব পরিচালনা করাই তার উদ্দেশ্য।[১০৩]

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ড. মেহদী বাযারগানকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন ও সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কোন দল বা গোষ্ঠীকে বিবেচনায় আনেননি। ৪-১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে দুটো সরকার ছিল। একটি ছিল ইসলামি বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার, হযরত ইমাম খোমেইনীর আদেশবলে এ সরকার অস্তিত্ব ও বৈধতা লাভ করে এবং গোটা জাতি এ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে। দ্বিতীয়টি ছিল পলাতক শাহের মনোনীত বখতিয়ারের সরকার।

১১ ফেব্রুয়ারি শনিবার বেলা ২টায় তেহরান রেডিও অফিস সশস্ত্র বাহিনীর দখলে থাকায় রেডিওর খবরে বলা হয় যে, ঐদিন বিকাল ৪টা থেকে সামরিক আইন বলবৎ হবে এ সময় হতে কেউ ঘরের বাইরে বেরোতে বা চলাফেরা করতে পারবে না। ঘোষিত সামরিক আইন শুরুর একটু আগেই সম্ভাব্য এ সামরিক আইনের ঘোষণা বাতিল করে প্রদত্ত ইমামের

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা হাতে হাতে ও মুখে মুখে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম এ ঘোষণায় বললেন- আজকের সামরিক শাসনের ঘোষণা একটি প্রতারনা ও শরীয়াত বিরোধী কাজ, জনগণ যেন কোন অবস্থাতেই এ ঘোষণার প্রতি কর্ণপাত না করেন। প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনারা ভয় পাবেন না কারণ, আল্লাহর ইচ্ছায় সত্য বিজয়ী হবে।[১০৪]

ইমাম খোমেইনীর এ ঘোষণায় ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালে লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র জনগণ সামরিক ঘাঁটিসমূহে হামলা করে তারা রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। হাজার হাজার শহিদ আত্ম-উৎসর্গ করার মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবের বিজয় ও শাহী সরকারের পতন নিশ্চিত করেন। এভাবেই ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হয় এবং বিশ্বের বুকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ইরান মাথা উচু করে দাঁড়ায়। এভাবে ইসলামি বিপ্লব ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্বে ইরানের আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রকে বিদায় দিয়েছে।[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইরানের ইসলামি বিপ্লবে বাংলাদেশের ভূমিকা

ইমাম খোমেইনী (রহ.) কে ইরান হতে তুরস্কে নির্বাসিত করার মাধ্যমে ইরানের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। ইরাকের নাজাফ হতে পারস্যের 'নওফেল লু শ্যোতে' সেই আন্দোলনের পরিপূর্ণতা লাভ করে। উক্ত সফল বিপ্লবের পটভুমিতে বাংলাদেশের ভূমিকা বেশী পরিলক্ষিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ হল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর ডাকে ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাস হতে ইরানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট বিরাজ করছিল। একই সময়ে মেজর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। উভয় রাষ্ট্রের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য মেজর জিয়ার পক্ষে ইরানের কোন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু ইরানের জনসাধারণের এ আন্দোলনের প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ হতে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সকল পর্যায়ের মানুষের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে ভারত, পাকিস্তান, ইরানের নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাযারগানকে অভিনন্দন জানিয়ে তার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে।[১০৬] অনুরূপভাবে বাংলাদেশের তৎকালীন সামরিক শাসক মেজর জিয়াউর রহমান ১৩ ফেব্রুয়ারি ইমাম খোমেইনী নির্দেশিত প্রধানমন্ত্রী মেহদী বাযারগানকে অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন।[১০৭] এছাড়াও ইরানের এ গণ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তৎকালীন দৈনিক পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। নিম্নে এর কিয়দাংশ উপস্থাপন করা হল-

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে *দৈনিক ইত্তেফাকের* উপ-সম্পাদকীয় কলামে ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর সমর্থনে একটি নিবন্ধ রচিত হয় । উক্ত নিবন্ধের উল্লেখযোগ্য কিছু বক্তব্য হল-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালে ইরানের শাসক রেজা শাহ পাহলবী তার রাজত্বের পঁচিশ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে তেহরানের মধ্য ভাগে নির্মাণ করেছিলেন এক গগণচুম্বি মন্যুমেন্ট। একযুগ পর সেই মনুমেন্টের নীচে দাঁড়িয়ে লাখ লাখ বিক্ষুব্ধ জনতা ময়ুর সিংহাসনের অধিকারী রোজা শাহ পাহলভির বিপক্ষে ঘোষণা করেছে এক চরম পত্র। ঘোষণায় বলা হয়েছে যতক্ষণ শাহ তার সিংহাসন ও ক্ষমতা ত্যাগ না করেন ততক্ষণ আন্দোলন চলবেই। মন্যুমেন্টের নীচে লাখ লাখ মানুষ গগণবিদারি শ্লোগানে ফেটে পড়ে- শাহের মৃত্যু চাই, খোমেনি আমাদের নেতা। খোমেনী এসময় প্যারিস নগরীর উপকণ্ঠে ছোট্ট এক বাড়ীতে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন। কিন্তু নির্বাসিত হলেও ইরানের রাজনীতিতে তিনিই এখন প্রধান পুরুষ। গত দুমাস ধরে গোটা ইরানে শাহের বিরুদ্ধে জনগণর যে অসন্তোষে ফেটে পড়েছে, তিনিই তার নেতা। নির্বাসিত হলেও আয়াতুল্লাহ খোমেনি প্যারিসে তার ছোট্ট আলয় থেকে পরিচালনা করছেন ইরানের রাজনৈতিক আন্দোলন।[১০৮]

১৯৭৯ সালে ১৬ জানুয়ারি শাহের দেশত্যাগ খবরের প্রতিক্রিয়ায় *দৈনিক ইত্তেফাক* এর উপসম্পাদকীয় কলামে ছাপা হয় -

গণ আন্দোলনের তীব্র চাপের মুখে শাহকে এখন দেশ ত্যাগ করতে হচ্ছে। কে জানে হয়তোবা চিরদিনের জন্য।

ইরানের শাহ হয়ত দেশ প্রেমিক ছিলেন, হয়ত ইরানকে আধুনিক ও উন্নত এক দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি এ ও হয়ত সত্য যে, এই ভূমিকা গ্রহণের বেলায় জনগণের স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ও মুল্যবোধ ততখানি বিবেচনার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেননি।'

ইরানের শাহ যার কাছে নতি স্বীকার করতে চলেছেন তার নাম গণ-ইচ্ছা। ইরানের মানুষ আর চায়না ময়ুর সিংহাসনে বসে বিধাতার মত কেউ দেশ পরিচালনা করুক, চায়না আল্লাহর পরেই উচ্চারিত হোক কোন মানুষের নাম। ইরানের মানুষ চায় ইরান শাসিত ও পরিচালিত হবে ইরানি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। ইরানি জনগণের এই ইচ্ছা ও দাবীর মুখেই তৈরী হয়েছে শাহের দেশত্যাগের মত অভূতপূর্ব সংবাদটি।[১০৯]

২৪ জানুয়ারি ১৯৭৮ চতুরঙ্গ সুহৃদ এর বক্তব্য শাহকে অত্যন্ত অসহায়ভাবে যাত্রীবাহি একটি বিমান স্বহস্তে চালিয়ে ত্যাগ করে আসতে হয়েছে স্বাধের জন্মভূমি ইরান। ইরান এখন রাজনৈতিক গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবলভাবে বিক্ষিপ্ত। আজকের ইরান

Dhaka University Institutional Repository

আগামীকাল কী বক্তব্য ও ভূমিকা নিয়ে আঞ্চলিক রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করবে তা কেউ জানেনা। কেউই বলতে পারেনা।

৩ ফেব্রুয়ারি *ইত্তেফাক পত্রিকার* উপ-সম্পাদকীয় কলামে 'স্থান কাল পাত্র লুব্ধক' শিরোনামে ইমাম খোমেইনীর ইরানে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ার ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে লেখক বলেন- শাপুর সরকারের উচিত হবে পদত্যাগ করে ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করা।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে *Far Eastern Economic Review* পত্রিকা আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর একটি সাক্ষাতকার প্রচার করে। উক্ত পত্রিকার রিজিওনাল এডিটর ডেনজিল পিরিজ স্বয়ং ফ্রান্সের 'নওফেল শ্যে'তে গিয়ে খোমেইনীর এ সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এ সাক্ষাতকারের মোদ্দা কথা হল এই যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ইরান হবে সম্পূর্ণ নিউট্রাল ও নন এলাইন্ড দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সকল দেশের সাথে সব ধরণের সামরিক চুক্তি বাতিল করা হবে। এবং ডেমক্রেটিক্যালি ইলেকটেড পার্লামেন্ট তৈরী সহ সব বিষয়ের সকল চুক্তি ও সমঝোতা পর্যালোচনা করে দেখবেন সেগুলো ইরানের স্বার্থের পরিপন্থী কিনা।

১৩ ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাকে মুল শিরোনাম পকিস্তান, ভারত, লিবিয়া ও পি.এল.ও'র স্বীকৃতিঃ নীচে ইরানের বাজারগান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ, সেনা বাহিনীর ওপর হামলা বন্ধ ও অস্ত্র জমাদানের নির্দেশ সংবলিত হেডিং দিয়ে সংবাদ শুরু করা হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে বাজারগানের প্রতি জিয়ার অভিনন্দন শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে। উক্ত সংবাদে বলা হয়-

> প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ইরানের প্রধানমন্ত্রী ড. মেহেদী বাজারগানের নিকট প্রেরিত এক অভিনন্দন বাণীতে আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বসূলভ সম্পর্ক বিকশিত হইতে থাকিবে। বাসস জানায় প্রেসিডেন্ট তাঁহার বাণীতে ইরানের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ হইতে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।[১১০]

Dhaka University Institutional Repository

১৪ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় বাজারগানের নিকট প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বার্তা শিরোনামে ইরান বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে উল্লেখ করে জিয়াউর রহমানের বাণী তুলে ধরা হয়। উক্ত বাণীতে জিয়াউর রহমান বলেন-

> আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে আপনার যোগ্য ও বিজ্ঞ নেতৃত্বে ইরান শান্তি ও স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির পথে ধাবিত হবে। আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে ইরানের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সাফল্য প্রদান করচক। ইরানের জনগণ বহু শতাব্দী যাবত ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ।[১১১]

তিনি নতুন প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য এবং ইরানের মহান জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে ইরানের পটপরিবর্তন শিরোনামে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের নানা দিক তুলে বলা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি ইরানের জনগণ তাদের জাতীয় স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। তাই বাইরের এ ধরণের কুচক্রি চক্রের খেলা ইরানের জাগ্রত জনগণ ব্যর্থ করে দিবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। পরিশেষে সম্পাদক বলেন- ইরান আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ এবং বিরাট এক প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক। আমরা একান্তভাবে ইরানে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। ইরানের এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন শুভ হোক এটিই আমাদের প্রার্থনা।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. শফিকুর রাহি, *মহাকালের মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, মিজান পালিশার্স, ঢাকা, ২০০৯, সম্পাদকের কথা।

২. *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১।

৩. মো. কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: উৎস অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮।

৪. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ.৮-৯।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১১ তম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৬৮।

৮. আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, করাচি, ৩ মে, ১৯৭০, পৃ. ১।

১০. আন্দালিব রাশদী, *বিদেশির চোখে ১৯৭১*, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭১, (দ্য সানডে টাইমস, জাম্বিয়া, ২২ আগষ্ট, ১৯৭১)।

১১. সিরাজুল ইসলাম(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, ,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭,পৃ. ৪৮৬।

১২. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট*, কাকলি প্রকাশনি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬৫।

১৩. মো. কামরুল হোদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

১৪. আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

১৫. মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১)*, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮৯-৩৯০।

১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯৮।

১৭. আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭২।

১৮. আফসান চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার ইতিহাস-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২১।

১৯. আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৪।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

২২. মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, সুবর্ণ, ঢাকা,২০১৩*, পৃ. ৭৪।

২৩. আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

২৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১২ তম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.১৮।

২৬. জগলুল আলম, *বাংলাদেশ বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯*, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫৬।

২৭. আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

২৮. শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গণ*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩১-৩২।

২৯. আন্দালিব রাশদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭, (ওয়াশিংটন ডেইলি স্টার, ৩০ জুন, ৭১)।

৩০. আন্দালিব রাশদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯, (নিউইয়র্ক টাইমস, ৩১ মার্চ, ৭১)।

৩১. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৮১২।

৩২. আফসান চৌধুরী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৪।

৩৩. আফসান চৌধুরী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪২ -৪৩।

৩৪. আন্দালিব রাশদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫, (দ্য ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, বোস্টন, ১৭ ডিসেম্বর, ৭১)।

৩৫. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহ্মদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব নগর সরকার) আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৪।

৩৬. মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬৯।

৩৭. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*,(বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব নগর সরকার), পৃ. ১৬৫।

৩৮. আন্দালিব রাশদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬. (দ্য হং কং স্ট্যান্ডার্ড, ২৫ জুন, ৭১.)।

৩৯. মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত). *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৪.

৪০. Abul Kalam (ed.), *Bangladesh: internal Dynamics and External Linkages* (Dhaka: University Press Limited, 1996), p. 186.

৪১. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা), পৃ. ৩৮৩।

৪২. প্রাগুক্ত, (বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস), পৃ. ৩৮৩।

৪৩. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরানের ভূমিকা), ঢা. বি.সংখ্যা ৩১-৩২, ২০১০, পৃ. ৩৮২।

৪৪. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৪।

৪৫. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৭৭।

৪৬. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, (বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-৫৮), ২০১৩, পৃ. ৬০।

৪৭. মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।

৪৮. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৫৩. মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

৫৫. ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯।

৫৬. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০। (*The Dawn*, 29 sept. 1971.)।

৫৮. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৫ই মে, ১৯৭১।

৫৯. মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫৮।

৬০. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২(আবু সাঈয়িদ, ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪২)।

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

৬২. আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৪।

৬৩. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা), ২০১৩, পৃ. ৪০২।

৬৪. *দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২০ আগস্ট, ১৯৭৫, পৃ. ১।*

৬৫. *নিউজ লেটার*, ৩৬তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃ. ৯।

৬৬. Frank cass, *Middle eastern Studies, London,* (Modernization and Development in Iran*),*volume -32, Number -3, July, 1996, p. 151.

৬৭. এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমন সাম্রাজ্য থেকে জাতীসত্ত্বা রাষ্ট্র*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যায় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৪০।

৬৮. *আলোর স্মারক, ইতিহাসে চীরভাস্বর অবয়ব খোমেনী*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩২।

৬৯. *আলোর স্মারক, ইতিহাসে চীরভাস্বর অবয়ব খোমেনী*, পৃ. ৩৩।

৭০. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ২৬৩।

৭১. সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী (অনূদীত), *পাহলভী রাজবংশের উত্থান পতন* (জেনারেল হোসেইন ফেরদৌসের স্মৃতিচারণ), জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯১-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৭২. Suroosh Irfani, *Revolutionary Islam in Iran (Popular Liberation or Religious Dictatorship)*, Zed Book Ltd., London, 1983, p. 151.

৭৩. John D. Stempel, *Inside The Iranian Revolution,* Indiana University press, Bloomington, USA, 1981, p. 214.

৭৪. ড. হামিদ আলগার, (একটি গোষ্ঠি কর্তৃক অনূদিত) *ইসলামী বিপ্লব ইরান দেশে*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৪৩৩ হিজরী সন, পৃ. ৮৯।

৭৫. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫।

৭৬. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, (অনূদীত), *আলোর পথে (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা)*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৪।

৭৭. M.S. El Azhary (edited), *The Iran Iraq war,* Croom Helm, London & Canberra, 1984, p. 45.

৭৮. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬।

৭৯. সালাহ উদ্দিন শোয়েব চোধুরী (অনূদীত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯২।

৮০. H.E. Chehabi, *Iranian Politics and Religious Modernism (The Liberation movement of Iran Under the Shah and Khomeini),* I.B tauris & co. ltd, London, 1999, p. 164.

৮১. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭।

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮।

৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯।

৮৪. আলোর স্মারক, *ইতিহাসে চীরভাস্বর অবয়ব খোমেনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

৮৫. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১-৭২।

৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

৮৭. Parviz Daneshvar, *Revolution in Iran*, Macmillan press ltd., Lonon, 1996, p. 114.

৮৮. John D. Stempel, *Inside The Iranian Revolution,* Indiana University press, Bloomington, USA, 1981, p.162.

৮৯. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২।

৯০. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৯।

৯১. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯।

৯২. Suroosh Irfani, *Ibid,* p. 176.

৯৩. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩।

৯৪. Parviz Daneshvar, *Ibid*, p.114.

৯৫. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২।

৯৭. *দৈনিক আজাদ*, ৫ জানুয়রি, ১৯৭৯, শেষ পৃষ্টা।

৯৮. *প্রাগুক্ত*, ৬ জানুয়ারি , ১৯৭৯।

৯৯. অধ্যাপক মনজুরুল আলম খান, *আধুনিক ইরান (১৭৯৬-১৯৮৬)*, ঢাকা, পৃ. ১২৪।

১০০. *আলোর স্মারক*, *ইতিহাসে চীরভাস্বর অবয়ব খোমেনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

১০১. Parviz Daneshvar, *Ibid*, p.124.

১০২. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬।

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

১০৪. অধ্যাপক মনজুরুল আলম খান, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৩১।*

১০৫. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৮৪।

১০৬. গোলাম রেজা কোরবাচাচী (সম্পাদিত), *হাফ্ত হাজার রোজে তারীখে আরান ওয়া ইনকলাবে ইসলাম* (ইরান ও ইসলামী বিপ্লবের সাত হাজার দিনের ইতিহাস) ২য় খণ্ড, বুনিয়াদে তারীখে ইসলাম ইরান, কোম, ইরান, ১৯৭১ সৌরবর্ষ, পৃ. ১১৪৪।

১০৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

১০৮. *প্রাগুক্ত*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

১০৯. *প্রাগুক্ত*, "চতুরঙ্গ, সুহৃদ" ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

১১০. *প্রাগুক্ত*, "চতুরঙ্গ, সুহৃদ" ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

১১১. *প্রাগুক্ত*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

১১২. *দৈনিক আজাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতি

১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় ও উদ্দেশ্য

৩. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

৪. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতি-প্রকৃতি

৫. ইরানের পররাষ্ট্রনীতি

৬. ইরানের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে বিপ্লবোত্তর ইরানের পররাষ্ট্রনীতি

৮. বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক সামঞ্জস্য

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতি

একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হল অপর রাষ্ট্রের সাথে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের মূলভিত্তি। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর যে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন্ম হচ্ছে নির্ভরশীলতার।[১] আদিকাল থেকে বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও আমরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে নিজের ওপর নির্ভর করে চলতে পারেনা। কোন-না-কোন বিষয়ে প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নির্ভরশীলতা যে রূপেই হোক না কেন নিজের স্বার্থের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে কেন্দ্র করে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ সম্পর্ককে বলি পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বজায় রাখা হয় কিছু নিয়ম নীতি অনুসরণ করে। যাকে আমরা পররাষ্ট্রনীতি বলে থাকি। 'নীতি' বলতে সাধারণত আমরা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণিত কার্যাবলিকে বুঝি।[২]

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি আসলে সে দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন বা সম্প্রসারণ। এদিক থেকে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে কেন্দ্র করেই তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয়। ব্যাপক অর্থে বলা যায় পররাষ্ট্রনীতি বলতে ঐ সমুদয় কার্যাবলী যা সেই দেশটি তার জাতীয় স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে গ্রহণ করে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, জাতীয় স্বার্থই মূলভিত্তি, যার ওপর কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি গড়ে উঠে।[৩] সাধারণত জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে যেসব উপাদান বিবেচনায় আনা হয়, সেগুলো হচ্ছে ভৌগোলিক ও সামরিক অবস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মতাদর্শগত পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ইত্যাদি।[৪] পররাষ্ট্রনীতির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে মো. আবদুল হালিম বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

> ধারণাগতভাবে পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত। আমরা বলতে পারি, পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের সে-সব কার্যের আধার, যা সে দেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের কারণে তার সীমা রেখার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে।[৫]

সর্বোপরি বহির্বিশ্বে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সত্তার প্রকাশ ও ভাবমূর্তির মূলভিত্তি হলো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি।

প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় ও বহু-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় ভৌগলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে। শেখ মুজিব থেকে শুরু করে বেগম খালেদা জিয়া পর্যন্ত, এমনকি শেখ হাসিনার সরকারও এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে গেছেন এবং যাচ্ছেন।[৬] স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কূটনীতির লক্ষ্য ছিল স্বীকৃতি ও সমর্থন।[৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থায় ভারত ও রাশিয়া ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে ১৯৭৪ সালে লাহোরে ২য় ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের সূচনা হয়। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপন ও পররাষ্ট্রনীতির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে কাজী জাহেদ ইকবাল বলেন-

> ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারির লাহোর ইসলামি সম্মেলনে যোগ দিয়ে, সদস্য পদ পেয়ে, বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক চূড়ান্ত আকার পায়। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর প্রতি জোর সমর্থন দিয়েছিল। এমনকি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ যুদ্ধের সময় মিশরীয় বাহিনীর জন্য পাঠানো হয় এক লক্ষ পাউন্ড চা। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

একটি ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা হিসেবে যাবার জন্য ৫০০০ (পাঁছ হাজার) সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল তৈরী হয়েছিল। এরপর দ্রুতই আরব দেশগুলো বাংলাদেশের দিকে ফিরতে শুরু করে।[৮]

পরবর্তীতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে জিয়াউর রহমান সরকার মুসলিম দেশ সমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সংবিধান সংশোধন করেন। জিয়াউর রহমানের সফল প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর হয়। এরশাদ সরকার পররাষ্ট্রনীতির এ ধারা অনুসরণ করে মুসলিম বিশ্বের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে ইরান ইসলামি বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে শাহের পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হলে পর 'Neither East nor West' শ্লোগানের ওপর ইরানের পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে ইরান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ওপর সংক্ষেপে আলোচনা এবং বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক গুলো উপস্থাপন করা হল।

১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য

প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তার জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বহির্বিশ্বের কাছ থেকে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি তৈরী করে থাকে। তবে বাংলাদেশ ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে একটি ক্ষুদ্র, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের নিরিখে দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামরিক সামর্থ্যের বিবেচনায় অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্র বিধায় দেশটির পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারেনা। এই অবস্থায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারে-

১. আত্মরক্ষা,

২. অর্থনৈতিক অগ্রগতি,

৩. অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের জাতীয় শক্তিকে রক্ষা ও প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা,

Dhaka University Institutional Repository

৪. নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা ও

৫. জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা।[৯]

২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় ও উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতের কলকাতায় প্রবাসী সরকারের প্রাথমিক কার্যক্রমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বিশ্ব কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথম একটি পরিকল্পিত কাঠামোর মধ্য দিয়ে দেশের পররাষ্ট্রনীতির সূচনা হয়। পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শিক ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল।[১০] পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও আন্তসম্পর্ক স্থাপনের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বহির্বিশ্বের সাথে আন্তসম্পর্ক গঠনের জন্য সংবিধানের আলোকে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করে তা বাস্তবায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দেশের নব গৃহীত এ পররাষ্ট্রনীতির আলোকে সকল কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বহির্বিশ্বে অবস্থিত কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের (দূতাবাস/মিশন) ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বৈদেশিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা নিবিড়করণ এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব সভায় একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সংহত ও সুদৃঢ় করণ-ই হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক চিঠিতে ভারত সরকারকে অবহিত করেছিল যে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদর্শসমূহ হবে জোটনিরপেক্ষতা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং ঔপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা।[১১] এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবিধ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ এবং এর অন্তরালে ক্রিয়াশীল নিয়ামক শক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘ সনদের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্ব

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ভুক্ত একটি জাতি হিসেবে সকল দায়-দায়িত্ব পালনের অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সমূহ সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুসৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অভিমুখ নির্ধারণ করে ৪ টি মূল স্তম্ভ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল-

প্রথমত: জাতীয় সমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

দ্বিতীয়ত: শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রিকরণ প্রয়াস চালানো।

তৃতীয়ত: নিজস্ব আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনে প্রত্যেক জাতির আধিকারের স্বীকৃতি প্রদান।

চতুর্থত: বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের সমর্থন দান।

একাত্তর সালে ভারতীয় উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে, বাস্তবে সে পরিবর্তনই বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি।[১২] বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতিটি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান অতি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের একটি ক্ষুদ্র দেশ, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সাথে বন্ধুত্ব (We are a small country, we want freindship with all and malice towards none) তাঁর এই উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত।

১. সকলে প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়:

২. অন্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনকরা: এ মূলনীতিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২ (৪) ধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যপারে হস্তক্ষেপ না করা: এ মূলনীতিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২ (৭) ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. বিশ্বশান্তি: বাংলাদেশ যে শান্তি কামনা করে, তা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই ব্যক্ত করেছিলেন তখন তিনি দ্ব্যার্থহীন ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

> ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড হিসেবে দেখতে চাই। এ ব্যপারে অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ যথার্থই বলেছেন যে, 'বাংলাদেশ শুধু শান্তির উদ্দেশ্যেই শান্তি চায়না, এর আরও কারণ হলো তার জাতীয় উন্নতি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত বিবেচনা।[১৩]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে পরিচালিত হবে, সে ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৫ (১) ও (২), ৬৩ এবং ১৪৫ ক ধারাগুলো মূলত বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সাথে সম্পর্কিত। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

> Bangladesh shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interfernce in the affairs of other countries, peaceful settelment of international disputes, and respect for international law and principles enunciated in the United Nations charter.[14]

অর্থাৎ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান, অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ না করা, যে-কোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান জাতিসংঘ তথা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান, সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধীতা, নিরস্ত্রিকরণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।[১৫] সংবিধানের ৬৩ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ঘোষণা-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পররাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পর্কিত।[১৬] অন্যদিকে সংবিধানের ১৪৫ ক ধারা মতে বলা হয়েছে বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে। এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং ধারায় পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি বা মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সংবিধানের এ ধারা পর্যালোচনা করে ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন-

১. সকলের প্রতি বন্ধুত্ব: (Friendship with all, malice to none)- জাতির জনকের এই ঘোষিত নীতি বাংলাদেশ তার জন্ম লগ্ন থেকে অনুসরণ করে আসছে। একটি ক্ষুদ্র, সমস্যা পীড়িত ও উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এ নীতি অনুসরণ নিঃসন্দেহে শ্রেয় ও প্রাজ্ঞ।

২. জোটনিরপেক্ষ: কোন সামরিক জোট বা ব্লকে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া বাংলাদেশের ঘোষিত নীতি। বাংলাদেশ স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী।

৩. জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমমর্যাদা: বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একে অপরের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা এবং সমমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিতে আস্থাশীল।

৪. অভ্যন্তরীণ ব্যপারে হস্তক্ষেপ না করা: অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ দাঁড়ায়, অন্য কোন বহিঃশক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যপারে হস্তক্ষেপ করুক তাও সে সহ্য করবে না।

৫. বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান: বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার করে যে কোন বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী।

৬. বিশ্বশান্তি: বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারাবদ্ধ। শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এমন অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরোধী। সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো তার ঘোষিত নীতি। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ পীড়িত নানা দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের আমরা জাতিসংঘের 'শান্তি মিশনে' সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখি। আয়তন ও শক্তিতে বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধে 'শান্তির দূত' ভূমিকা পালনে সে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ যে মনেপ্রাণে শান্তি কামনা করে তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই ' এ দ্ব্যার্থহীন ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধীতা করা। বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে বাংলাদেশের সর্বদা সমর্থন করে।

৮. মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক: বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র হওয়ায় এদেশের জনগণ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক-সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তাগিদ অনুভব করে। এছাড়া, অর্থনৈতিক কারণেও এ ধরনের সম্পর্ক বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর। তাই মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং তা সংহত, সংরক্ষণ ও জোরদার করতে এ দেশ বিশেষভাবে আগ্রহী।

৯. অর্থনৈতিক অগ্রগতি: বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র, সমস্যা সঙ্কুল, উন্নয়ন প্রয়াসী একটি দেশ। তাই বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।[১৮]

বাংলাদেশ যে পররাষ্ট্রনীতি সব সময়-ই অনুসরণ করেছে, সেটির মোদ্দাকথা অর্থনৈতিক অর্জন হওয়ায় একে বিশেষজ্ঞরা অর্থনৈতিক কূটনীতি বলে অবিহিত করেছেন।[১৯] বিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে বর্তমানে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে একটি ভারসাম্য নীতিতে এসে অবস্থান করছে। বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে অনানুষ্ঠানিকভাবে তাকে কোন না কোন পক্ষ নিতেই হয়েছে।[২০] আরব, ইউরোপ ও আফ্রিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী সহ বিভিন্ন মিশনে নেতৃত্ব দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের রাষ্ট্র সভায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক একটি স্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে। সম্পর্কের দিগন্ত সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয় সদস্য। আমেরিকা, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, কানাডা, রাশিয়া সহ সকলের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন বিশ্ব ফোরামে তার ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রশংসনীয়। মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান রয়েছে। একটি ছোট, সমস্যা পীড়িত, উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে এরূপ অবস্থান নিঃসন্দেহে খুবই সহায়ক, প্রাজ্ঞ ও বাস্তব ভিত্তিক।[২১]

৪. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতি প্রকৃতি

মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক সফলতার ফসলই আমাদের এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতাপূর্ব প্রবাসী সরকারের চীন ও আমেরিকার পাকিস্তান নীতির বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী তাদের স্বীকৃতি অর্জনের প্রচেষ্টাই ছিল প্রবাসী সরকারের সাফল্যের দলিল। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়' এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হলেও বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী বিভিন্ন শাসনামলে এ নীতির পরিবর্তন দেখা যায়। বৈশ্বিক পরিবর্তন, শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও পরাশক্তিগুলোর পালাক্রমিক আচরণ এবং বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক পটপরিবর্তনে যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় তার আলোচনায় ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন-

> স্বাধীনতা উত্তর শাসনকালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানো, বাংলাদেশের জন্য ১৪০ টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ, ওআইসি সম্মেলন ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান ইত্যাদি একটি সার্বজনীন পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত বাহি।[২২]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুটো ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ১৯৭৫ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের জুন পর্যন্ত।[২৩]

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার হতে দেশে এসে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২-এর ১৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বলেন-সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়-এমন নীতির দ্বারা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি প্রথম এ ধরনের উক্তি করেছিলেন।[২৪] প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতি আদায় প্রচেষ্টার-ই ধারাবাহিকতা পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

মুজিব সরকারের ভেতর দেখা গেছে।[২৫] ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে অনুসৃত বাংলোদেশ পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুটি-কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় ও বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন।[২৬] উপর্যুক্ত সময়ে ড. কামাল হোসেন ও আবদুস সামাদ আজাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক ও কর্ণধার। স্বীকৃিতি আদায়ের কূটনীতিতে শেখ মুজিব সরকার দারুণ সফলতা দেখিয়েছিলেন।[২৭] তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রায় ১১৬ টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়াও জাতিসংঘ, ও আই সি, কমনওয়েলথ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ প্রায় সকল আর্ন্তজাতিক সংস্থা সমূহের সদস্য পদ লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন এ দেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। স্বাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে কাজী জাহেদ ইকবাল বলেন-

> সেই সময় মুজিব সরকার ভারত-সোভিয়েত অক্ষের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। বিষয়টি পশ্চিমারা ভালভাবে নেয়নি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিমাদের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস চলছিল। মুসলিম দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ হওয়ারও প্রয়াস চলছিল। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সঙ্গে বৈঠক, '৭৪ সালে ভূট্টোর সঙ্গে বৈঠক প্রভৃতি ঐ প্রয়াসেরই অংশ।[২৮]

১৯৭৫ এর আগস্ট মাসে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। রাষ্ট্রীয় নীতি পরিবর্তনের এটিই ছিলো প্রথম পদক্ষেপ।[২৯] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার পট-পরিবর্তনের কারণে চীন সহ আরব রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐ দুদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মুজিব আমলেই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল এবং এমন কি '৭৫ শেষ নাগাদ তাদের স্বীকৃতিও আশা করছিল বাংলাদেশ।[৩০] খন্দকার মোশতাক পশ্চিমা প্রীতি নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর হতে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ক্যু পাল্টা

Dhaka University Institutional Repository

ক্যু-এর এক পর্যায়ে কর্ণেল তাহেরের সহায়তায় জিয়া ক্ষমতায় আসীন হন।[৩১] ১৯৭৫ সালের আগস্টে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মতো বৈদেশিক ক্ষেত্রেও ব্যপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নতুন শাসক গোষ্ঠি বাংলাদেশেকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তান-চীন-সৌদি আরব-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রমূখী করে তোলে।[৩২] মুজিব পরবর্তী সরকারগুলোর পশ্চিমা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির পেছনে পরিষ্কার দুটি কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত- অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো এবং দ্বিতীয়ত- নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।[৩৩]

মেজর জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করে তৎকালীন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মধ্যবর্তী দেশগুলো এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের চেষ্টা মুজিব আমলের শেষ থেকেই চলছিল এবং পরবর্তীদের জন্য তা জরুরী ছিল- এটি সহজে বোধগম্য। [৩৪] মুশতাক সরকার খুব অল্প সময় শাসন করলেও ঢাকা ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেন। ফলত ঢাকা ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে।[৩৫] এ দৃষ্টি ভঙ্গিকে সামনে রেখেই তিনি মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হন। মুজিব সরকার পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশ পশ্চিমা এবং তেল সমৃদ্ধ মুসিলম দেশ সমূহের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।[৩৬] একই সাথে ভারত-সোভিয়েত অক্ষ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে তা যুক্তরাষ্ট্র, সুদান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া এবং ব্রিটেনে প্রশিক্ষণের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৭] সংবিধান সংশোধন করে সংবিধান থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে তৎপরিবর্তে "সর্ব শক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস এবং আস্থা" "সামাজিক ও অর্থনৈতিক সু-বিচার"এর নীতি প্রতিস্থাপন করা হয়।[৩৮] সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়। এছাড়াও পররাষ্ট্রনীতিতে 'মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা'র নতুন ধারা যোগ করা হয়। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক বলেন, কোনো একটা দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভূক্তি দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতি নির্দেশিত হয়না এবং মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশ নিজের উপর কর্তৃত্বহীন।[৩৯]

১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক সংবিধান সংশোধন করে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন তাহল -

> 25. [(1)] The state shall base its International relation on the principles of respect for national sovereignty and quality, Non-interference in the internal affairs of other countries, Peacefull settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enuncited in the United Nations Charter, and on the basis of those principles shall-
>
> (a) Strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament
>
> (b) Uphold the right of every people freely to determind and build up its own social, economic and political system by ways and means of its own free choice, and
>
> (c) Support oppressed peoples throughout the world waging a just struggle against imperilism, colonialism or recialism.
>
> [(2)] The state shall endeavour to consolidate, Preserve and Strengthenm fraternal relations among Muslim countries based on Islamic Solidarity.[40]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংশোধিত সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়। বিশেষ করে আরব বিশ্বসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগী হয়। শুধু সৌদি আরবের সাহায্য ১৯৭১-৭৫ সালের তুলনায় ১৯৭৬-৮২ সালে ১০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৫৫৪১.৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল।[৪১] ১৯৭৮ সালের ১০ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হলে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের সক্রিয় থাকা শুরু হয়। আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলোকে নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। যা ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সার্ক (South Asian Association for Regional Cooperation) নামে আত্মপ্রকাশ করে। জিয়াউর রহমান নিহত হলে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে হটিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই সামরিক আইন জারি করেন। পুরোদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়। এরশাদ বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রে ফিরে আসার চেষ্টা করলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার সরকারের সময়কালে জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতিকেই রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বলে মনে করেন। সে অনুযায়ীই তিনি পশ্চিমা ও আরব বিশ্বের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ সময়কালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে-

১. ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় ইসলামি সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক,
২. ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার ৭ জাতি বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশের নেতৃত্বে সার্ক গঠন করা এবং
৩. ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘের সভাপতি পদে তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর নির্বাচিত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইরানের পররাষ্ট্রনীতি

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, সরকারের প্রকৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ইরানের পররাষ্ট্রনীতিতেও নিয়ামক সমূহের প্রভাব ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরান ভৌগোলিকভাবে কৌশলগত স্থানে অবস্থানের জন্য বৃহৎশক্তিগুলো ইরানের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যে, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল ভারত উপমহাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। এম.এ কাউসার বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ইরানকে বিবেচনা করেছিল তার নিরাপত্তা বলয় হিসেবে এবং সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষে প্রবেশদ্বার হিসেবে। আর ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় ইরানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।[৪২]

১৯৮০র দশকে শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইরানের পররাষ্ট্রনীতির কারণে আমেরিকার একক আধিপত্য বিস্তার লাভ এ ভূখণ্ডের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এই শাসনের দুইটি প্রধান দিক লক্ষ্য করা যায়-রাজনৈতিক ক্ষমতার চাবিকাঠি নিজের হাতে রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখা।[৪৩] যে কারণে রাশিয়া নিজ স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইরানের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকে প্রত্যক্ষ ও আলেম সমাজকে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। শাহের নিজের এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক স্বার্থে যে বিশেষ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা শুরু হয় মুসাদ্দেকের পতনের পর হইতে।[৪৪] শাহের আমেরিকা প্রীতির কারণে দেশের সাধারণ জনগণ তার শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পদে বারবার পরিবর্তন করেও শেষ রক্ষা হয়নি। আলেম সমাজ ও সাধারণ জনগণের আন্দোলনের মুখে ১৯৭৯ সালে শাহের দেশত্যাগের মাধ্যমে পাহলভি শাসনের অবসান ঘটে এবং ইরানে ইসলামি বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের ইরানে ইসলামি বিপ্লবের আদর্শ ইরানের পররাষ্ট্রনীতিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে। এই বিপ্লব ইরানের ধর্মনিরপেক্ষ, স্বৈরাচারি শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এটি একটি করণিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে যার চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল সুপ্রীম গাইড অথবা সর্বোচ্চ নেতার নিকট যিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে Kennth Katzman বলেন-

> ১। বিপ্লবের পর প্রথম বছর ইরান তার বিপ্লব পাশ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রপ্তানি করে, কিন্তু ১৯৯০ এর পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত এ লক্ষ্যে ইরান নিঃসন্দেহে এগিয়ে যায়।
>
> ২। ইরানের নেতা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে তারা মধ্যপ্রাচ্যের নিপীড়িত, শোষিত মানুষের পক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষ বিশেষভাবে ইসরায়েলের বিপক্ষে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না এবং এ অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘু শিয়াদের পক্ষে কাজ করবে যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে কিংবা সুবিধাবঞ্চিত।
>
> ৩। ইরানের অভিযোগ উক্ত অঞ্চল পশ্চিমা শক্তির আধিপত্যবাদ ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দৈন দশায় নিপতিত এবং এ আধিপত্যবাদের সমাপ্তি অবশ্যই ঘটবে। ইরানি কর্মকর্তারা মনে করে এ আধিপত্যবাদের অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সৃষ্টি এবং এতে ফিলিস্তিনিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[৪৫]

যে সকল জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ইরানের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি তৈরী হয় তা হল-

> ১। ইরানের জাতীয় স্বার্থই ইরানের বৈদেশিক নীতিতে মোড় নিয়েছে এবং মাঝে মাঝে তা ইরানের জটিল মতাদর্শে আবর্তিত। ইরানের নেতারা দাবি করেন পারস্য উপসাগরের অধিকাংশ এবং মধ্য এশিয়ার একটি ক্ষুদ্রতর অংশ তাদের অধিকারে স্বীকৃত হবে। তারা মনে করে ইরান উন্নত সভ্যতার ধারক এবং স্বাধীন। তবে এ নিয়ে পারস্য উপসাগরের ছয় রাষ্ট্রের (সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ওমান) সাথে তাদের বিরোধ ও লক্ষণীয়। [যার পরিপ্রেক্ষিতে ছয়টি রাষ্ট্র মিলিতভাবে Gulf Cooperation Council (GCC) গঠন করে।] একইভাবে এই নীতিতে বা বিশ্বাসে তারা তাদের বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে এবং সে মোতাবেক বিভিন্ন ব্যবস্থাও গ্রহণ করে।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

২। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইরান তার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে শিয়া জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এটা বেশিরভাগ সমর্থিত হয়েছে শিয়াদের আযারবাইজানের তুলনায় খ্রিস্টান অধ্যুষিত আর্মেনিয়ায়। ইরান মধ্য এশিয়ার দেশসমূহে ইসলামি বিপ্লবের সমর্থন থেকে নিজেদের বিরত রাখে রাশিয়ার বিরোধিতার মুখে, কেননা রাশিয়াই হচ্ছে ইরানের অস্ত্র ও প্রযুক্তি রপ্তানিকারক দেশ।

৩। ইরানের নেতাদের অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে এবং ইরানের নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের এই মিত্রদের প্রচেষ্টা প্রতিহত বা ব্যাহত করতে প্রস্তুত।[৪৭]

৬. ইরানের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিই হলো নিজের অবস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে মুসলিম দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা। ইসলামের নবজাগরণে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। ইরানের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেতে গিয়ে আবদুল করিম আলি নাযাফি বলেন-

> The universal nature of the Islamic State is vividly reflected in its fopreign relations. The Islamic State exists between small and big domains. The small realm and domain is the Islamic realm while the big realm is that of humanity and its relationship with the Islamic realm is based on the protection on the Muslims, defending their rights and rendering possible assistance to them. And its relationship with the great realm of huminity consists of steps toward the promotion and spread of the Islamic call, protection of the downtrodden and resistence against the pillars of arrogance and chief of sedition who are hindrance to the penetration of the light of monotheism inti the hearts of people.[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বিপ্লবোত্তর ইরানের যে সকল তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পর ইরানের সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে চলে যায়। দুটি কারণে এ দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন ঘটে, প্রথমত- ইসলামি বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা কর্তৃক শাহের প্রতি নগ্ন সমর্থন, দ্বিতীয়ত- ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে শাহকে আশ্রয় দান। এ সকল ক্ষোভের বহি:প্রকাশ ঘটে ইরানে মার্কিন কূটনীতিকদের জিম্মি ঘটনার মধ্য দিয়ে। এ পর্যায়ে ইরানের জনগণ আমেরিকার রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে আমেরিকার কূটনীতিকদের জিম্মি করে। পরিশেষে আমেরিকান ব্যাংকে বিপুল পরিমান জব্দকৃত ইরানের অর্থ ফিরিয়ে দেয়া ও ভবিষ্যতে ইরানের অভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গিকারের মাধ্যমে জিম্মি ঘটনার অবসান ঘটে। পরবর্তীতে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ পরায়ণ নীতি গ্রহণ করে। ইউরোপের দেশগুলো আমেরিকার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ইরানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে ইরানের ইসলামি সরকার ইউরোপের ব্যাপারে ও কঠোরনীতি গ্রহণ করে। তবে ইরান সরকারের গৃহিত এ নীতি আমেরিকার মতো কঠোর ছিলনা।

ইরানে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ায় রাশিয়া মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্বস্তি বোধ করে। ইরানে শাহের পতন মানেই ছিল আমেরিকার পরাজয়। রাশিয়ার পাশে আমেরিকার শক্তিশালী অবস্থানকে রাশিয়া কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। সে কারণেই বিপ্লবের শুরু হতেই রাশিয়া বিভিন্ন ভাবে ইরানের বিপ্লবী দলগুলোকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী সময়ে রাশিয়া সমর্থিত হিযবে তুদেহ দলের প্রকাশ্য বামপন্থি রাজনীতি ইসলামি বিপ্লবী সরকার মেনে না নেয়ার কারণে রাশিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করে। একই সময়ে আফগানিস্তানে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরানও উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিন্তু আফগানিস্তান ইসুতে ইরান নিজ দেশের স্থিতিশীলতার কথা চিন্তা করে শক্ত অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেনি। তদুপরি রাশিয়া বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র হওয়ায় ইরান স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী পররাষ্ট্র নীতিতে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তবে ইরাকের সাথে ঘনিষ্ঠ মুসলিম দেশসমূহ যারা ইরান-ইরাক যুদ্ধে সরাসরি ইরাকের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং মার্কিন সখ্যতার কারণে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সমর্থক মুসলিম দেশগুলোর ব্যপারে ইরানের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা ও মুসলিম দেশসমূহের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইসলামি মুল্যবোধের আলোকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরী করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের পরিধি আলোচনা করতে গিয়ে মোহাম্মদ রেজা দেহশিরি বলেন-

> Imam Khomeini emphasized the Islamic government's severance of relationship with two types of Muslim countries. One refers to countries, which by attacking the Islamic country have committed aggrassion and revolted against the Islamic government. Within this type, Iraq Under the leadership of Saddam Husayn can be cited. The other refers to countries, which have betrayed the ideal of the Muslim by concluding a freindship treaty with the Quds-occupier regime. Within this type. Egypt under Anwer Sadat can be cited as it betrayed the Islamic world by concluding the Camp David Accord.[49]

আরব দেশগুলো ছাড়াও গোটা মুসলিম বিশ্বের সাথে ইরানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের সূচক বিষয়ের আলোচনায় ফিরোজ দৌলতাবাদি বলেন-

> In describing the stutus of the Muslim World in the strategy of the Islamic Republic of Iran, at the outset, it (Iran) has to clarify its objective for this endover because the following three general options can seemingly be regarded as the possible objectives of the Islamic Republic of Iran.

Dhaka University Institutional Repository

1. The protection of the Muslim World, individually and collectively, will prevent the formation of execution of any kind of threat to the national security or national interests of the Islamic Republic of Iran.
2. The protection of the Islamic Republic of Iran will prevent the formation and execution of any kind of threat to the national security or national interests of all Muslim countries, and
3. In a mutual relationship, the expectations of one another can be appropriately answered.[৫০]

ইমাম খোমেইনী (রহ.) সদ্যপ্রসূত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামি বিপ্লব তথা ইসলামের নবজাগরণের পয়গাম পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। তার এ আহ্বানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এড. সাদ আহমদ বলেন-

> ইমাম খোমেনি (রহ.) বিশ্বের অন্যান্য অংশ হতে ইরানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি। তিনি একটি নতুন শ্লোগান চালূ করেন 'পূর্ব নয় পশ্চিম নয়, ইসলামই শ্রেষ্ঠ এর মাধ্যমে তিনি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সকল শিবিরের প্রতি সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন। এই শ্লোগান ইসলামি উম্মাহকে একটি নতুন ধরণের শিবির গঠন এবং পরাশক্তিসমূহের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে অনুপ্রেরণা দেয়। ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের সঠিক উদ্দেশ্য জানতে পেরে ফিলিস্তিন, লেবানন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন ও অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের অস্তিত্বের সংগ্রামে নতুন গতি সঞ্চার হয়। ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য জোরদার করার চেতনা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫১]

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মহানায়ক ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির আলোকে মুসলিম বিশ্ব সহ গোটা বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের সাথে অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের এ সফলতা পুরো মুসলিম জাতিকে নতুন ভাবে জাগিয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইমাম খোমেইনী (রহ.) যে সকল বিষয়ে অটল ছিলেন তা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

১. ইরানের ওপর চাপিয়ে দেয়া সবধরনের সমঝোতা ও চুক্তি বাতিল করা।

২. সেন্টো প্যাক্ট থেকে বেরিয়ে আসা।

৩. যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, দক্ষিন আফ্রিকা এবং মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৪. যে সকল দেশ ইসরাইলকে সমর্থন করে সেগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অবৈধ ইসরাইল সরকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল কোম্পানির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

৫. আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের নিন্দা করা এবং মুজাহিদদের প্রতি সমর্থন প্রদান।

৬. বিশ্বের সকল মুক্তি আন্দোলন এবং ইসলামি মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান।

৭. ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়াম কনসোর্টিয়াম (OPEC) এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়া।

৮. 'পূর্ব ও নয় পশ্চিম ও নয়' নীতি বজায় রাখা।

৯. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়া।

১০. চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে জড়িত থেকেও ইরান তার নীতির প্রশ্নে অটল থাকা।

১১. আমেরিকাকে 'শয়তানে বুজুর্গ' বা বড় শয়তান বলে আক্ষা দেয়া এবং তার মোকাবিলা করা।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর থেকে বিপ্লবোত্তর ইরানের পররাষ্ট্রনীতি

১৯৫১ সালে তেল জাতীয়করণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। সংসদে তেল জাতীয়করনের আইন পাস হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ইঙ্গ-ইরানি তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আপত্তি আসে। কোম্পানি ১৯৩৩ সালের চুক্তির বরাতে দাবী করে যে, এক তরফা ভাবে চুক্তি বাতিল করা করা যাবে না এবং ১৯৩৩ সালে সম্পাদিত চুক্তি ষাট বছর অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।[৫৩] ইতোমধ্যে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ইরানে ব্রিটিশ বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে শ্রমিক হরতাল পালিত এবং দুজন ব্রিটিশ কর্মচারীসহ কয়েকজন দাঙ্গায় নিহত হন। ব্রিটিশ নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ব্রিটিশ সরকার পারস্য উপসাগরে রণতরী পাঠায় এবং যুদ্ধের হুমকি দেয়। এতদসত্ত্বেও ইরানি জনগণ তাদের এই ঘৃণ্য চাল নস্যাৎ করে দেয়। অবশেষে ব্রিটেন বিষয়টি ১৯৫১ সালের ২২ মে আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করে। কিন্তু সেখানে বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। ২৭ সেপ্টেম্বর আবাদান ইরানিদের দখলে যায় এবং ৪ অক্টোবর ব্রিটিশ কর্মচারীগণ ইরান ত্যাগে বাধ্য হয়। এর ফলে ইরানের জাতিয় তেল কোম্পানি ইরানের সমস্ত তেল ক্ষেত্রসমূহ ও আবাদান শোধনাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইরানের সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ নিরসনের জন্য হ্যারিম্যান-ফর্মূলা তৈরি করা হয়। কিন্তু মোসাদ্দেকের আপোষহীন নীতির ফলে এই ফর্মূলা ব্যর্থ হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যানরি ট্রুম্যান কর্তৃক তার বিখ্যাত 'চার নীতি' ঘোষিত হবার পর আমেরিকানদের প্রচার অভিযান এমনই ব্যপকতা লাভ করে যে, অনেক দেশেরই জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সত্যি সত্যিই এর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তারা বিশ্বাস করতে থাকেন যে, আমেরিকানরা যে মুখরোচক শ্লোগান তুলছে তা পুরোপুরিই তাদের মনের কথা এবং বাস্তবভিত্তিক।[৫৪] ইরানেও ব্রিটিশদের প্রতি জনমনে বিরাজমান ঘৃণা ও আক্রোশের প্রেক্ষাপটে

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন প্রচার বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং সাধারণ জনমত কমবেশি আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইরানে সোভিয়েত ও ব্রিটিশ সৈন্য ইরানে অবস্থান করলে তা বৃটেনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। বৃটেন আশঙ্কা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ত ইরানকে বিভক্ত করে ফেলত। এমতাবস্থায় বৃটেন ইরানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনি।[৫৫] কিন্তু ইরান থেকে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহারের পর বৃটেন ইরানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির বিরোধিতা শুরু করে। এ সময় শাহ মোহাম্মদ রেযা পাহলভী মনে করেছিল তাকে সিংহাসনে টিকে থাকতে হলে যে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী তার নিকট তাকে আশ্রয় নিতে হবে।[৫৬] তাই তিনি আমেরিকাকে আশ্রয় করে তার দুর্বল অবস্থানকে শক্তিশালী করার চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু শাহের বৃটেন সফরের পর ইরানের শাসক গোষ্ঠী পুনরায় বৃটিশ শাসকদের অনুগত হয়ে পড়ে। তবে সেই প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তেল জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শক্তি সেখানে পতন ঘটে সেখানে মার্কিন বলয়ের প্রভাব দৃঢ় হয় যা ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ইসলামি বিপ্লবের গতিপথে ইরানি জনগণের মুখে অব্যাহতভাবে উচ্চারিত শ্লোগানগুলোর মধ্যে একটি ছিলো 'পূর্ব ও নয়, পশ্চিম ও নয়, ইসলামি প্রজাতন্ত্র' এবং এখনো এই শ্লোগানটিই উচ্চারিত হচ্ছে। এই শ্লোগানের মধ্যেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বৈদেশীক নীতির খসড়া রূপরেখা ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচ্যের কিংবা প্রশ্চাত্যের যে কোন ধরনের আধিপত্যকে নাকচ করে দেয়াই হচ্ছে ইসলামের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক আদর্শ, ঠিক যেমনি ইসলামি পররাষ্ট্রনীতিতে আধিপত্য চাপিয়ে দেয়াকে প্রত্যাখান করা হয়েছে, একই সাথে বঞ্চিত জাতিসমূহকে সাহায্য করা এবং ঔপনিবেশবাদ ও পরাশক্তির বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন এবং সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে সহযোগিতা করাকে ইসলামি ব্যবস্থার পররাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপটে একটি খোদায়ি ও ইসলামি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব বলে বিবেচনা করা হয়।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর নির্দেশনায় একটি সংবিধান রচনা করা হয়। ইরানের বিশেষজ্ঞ পরিষদ ১৫ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে সংবিধানের খসড়া কপি চূড়ান্ত করেন। ৩ ডিসেম্বর এ সংবিধানের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ৯৮.২% ভোটে এ খসড়া সংবিধান ইরানের ভোটার জনগণের ভোটে অনুমোদিত হয়।[৫৮] পরবর্তীতে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই সংবিধান বলবৎ থাকে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্র পরিচালনায় এ সংবিধানের বিভিন্ন দূর্বলতা পরিলক্ষিত হলে ১৯৮৯ সালে এটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়। বর্তমানে এ সংবিধানটিই কার্যকর রয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সংবিধানের ১০ম অধ্যায়ে Foreign Policy শিরোনামে স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে তা হল-

Article 152

The Foreign policy of the Islamic Republic of Iran is based upon the rejection of all forms of domination, both the exertion of it and submission to it. the preservation of the independence of the country in all respects and its territorial integrity, the defence of the rights of all Muslims, non-alignment with respect to the hegemonic superpowers, and the maintenance of mutually peaceful relations with all non-belligerent States.

Article 153

Any form of agreement resulting in foreign control over the natural resources, economy, army, or culture of the country, as well as other aspects of the national life, is forbidden.

Article 154

The Islamic Republic of Iran has as its ideal human felicity througout human society, and considers the attainment of independence, freedom, and rule of justice and truth to be the right of all people of the world. Accordingly, while scrupulously refraining from all forms of interference in

Dhaka University Institutional Repository

the internal affairs of other nations, it supports the just struggles of the mustad'afin against the mustakbirun in every corner of the globe.

Article 155

The government of the Islamic Republic of Iran may grant political asylum to those who seek it unless they are regarded as traitors and saboteurs according to the laws of Iran.[৫৯]

সাংবিধানিক কাঠামো ছাড়াও ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যে মনোভাব পোষণ করতেন তা হলো-

1. Non-reliance on the global powers, which hasbeen manifested in the Imams policy of "Neither East nor West",
2. Negetion of domination and subservience to domination,
3. Preservation of the existance and territorial integrity of the country, and observing the long-term interests of the system,
4. Invitation toword the monotheistic values and fundamentals of Islam,
5. Defense of integrity and reputation of Islam in the International gatherings,
6. Expressiuon of sympathy to the downtrodden of the world and inviting them to unite with another,
7. Invitation toword the unity of Muslims,
8. Strategic compaign against the Quds-occupying regime,
9. Harmonious coexistance and forging of equitable and freindly relations with countries of the world and negetion of Isolationism, and
10. Introduction of Islam as a comprehensive, perfect and practical religion. [৬০]

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং ব্যাপক ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক সামঞ্জস্য

রাজতন্ত্রশাসিত ইরানে একদিকে পার্লামেন্ট মজলিশ থাকলেও ১৯২১ সাল থেকে রেজা শাহ পাহলভির একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলছিল। পাকিস্তানের প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিজেকে আর্য বংশোদ্ভূত এবং ইরান থেকে আগত ঘোষণা দুদেশের স্বৈরাচারী শাসককে কাছাকাছি এনে দেয়।[৬২] বিপ্লব পূর্ববর্তী শাহের শাসন আমলে ইরানের পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকা কেন্দ্রিক পরিচালিত হয়। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রনীতি ছিল আমেরিকা বিরোধী শ্লোগান 'Neither East nor West' এর পূর্ণ বাস্তবায়িত রূপ। অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি অল্প সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক পট-পরিবর্তনের কারণে পশ্চিমা ঘেঁষা মুজিব সরকারের শুরু করা পররাষ্ট্রনীতি পরবর্তী সরকার তা অনুসরণ করে। ইরান-বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও পররাষ্ট্রনীতিতে যে সকল সামঞ্জস্য রয়েছে তা নিম্নরূপ-

প্রতিটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে। বাংলাদেশ ও ইরান এর ব্যতিক্রম নয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে সাংবিধানিকভাবে সকলের প্রতি বন্ধুত্বের (Friendship with all, malice to none) অঙ্গিকার করা হয়। অন্যদিকে ১৯৭৯ সালে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মুলমন্ত্র ছিল 'প্রাচ্য নয় পাশ্চাত্য ও নয়' (Neither East nor West)। মুলত এ একটি বিষয়েই বাংলাদেশ ও ইরানকে কাছাকাছি এনে দেয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক নীতির দুটি ধারা লক্ষ্য যায়। যার একটি হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি, অপরটি হল শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু পরবর্তী জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধান সংশোধিত পররাষ্ট্রনীতি। অন্যদিকে ইরানেরও ১৯৭১ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দুইটি ধারা লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। একটি হলো ১৯৭১-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত, অপর ধারাটি হল বিপ্লবোত্তর ইসলামি বিপ্লবী সরকার এর পররাষ্ট্রনীতি।

১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আরব বিশ্বের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে। ফিলিস্তিনের সার্বভৌম অখণ্ডতা রক্ষা ও আরব মুসলমানদের প্রতি ইসরাইলের যুদ্ধের তীব্র নিন্দা জানায় ও সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ যুদ্ধাহত আরবদের জন্য মেডিকেল টিম প্রেরণ করে। একই বছরে বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের মিশন খোলার অনুমতি প্রদান করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এ সহমর্মিতা বুঝতে পেরে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশেকে ও আই সি'র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অন্যদিকে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইরানি জনগণের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও শাহের আমেরিকা প্রীতির কারণে ইরান তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর থেকে ইসরাইলের প্রত্যক্ষ শত্রু হিসেবে ইরানের আবির্ভাব ঘটে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও ইরানের অবস্থান মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ও ইরানকে একই বৃত্তে দাঁড় করিয়ে দেয়।

১৯৭৭ সালের ২৩ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সংবিধান সংশোধন করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সু-বিচার এর নীতি প্রতিস্থাপন করা হয়। সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করা হয়। এছাড়াও পররাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নতুন ধারা যোগ করা হয়। অনুরূপভাবে বিপ্লব পরবর্তী ইরানের সংবিধানেও আল্লাহ তায়ালাকে ইরানের সংবিধানে মানুষের এবং মহাবিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কার্যক্রমের সর্বত্র আল্লাহ তায়ালাকে সর্বোচ্চ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী অস্তিত্ববান এক স্বত্তা হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।[৬৩] একই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলাদেশ ও ইরান সমপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় নীতিতে অবস্থান করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধ ও একটি সম্মানজনক সমাধানের জন্য ও আই সি কর্তৃক যে কমিটি গঠন করা হয় তাতে বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এ সময়ে জিয়াউর রহমান ইরান ও ইরাক সফর করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যুদ্ধ বন্ধে নিজেদের অবস্থানের জন্য যে নীতি গ্রহণ করেন সেই নীতি ইরানের নীতির সাথে মিলে যায়। এর ফলে ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হয়।

এছাড়া জাতীয় সমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস। নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনে প্রত্যেক জাতির অধিকারের স্বীকৃতি এবং বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামের সমর্থন নীতি বাংলাদেশ ও ইরানকে নীতিগতভাবে কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ও ইরানের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব দিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রফসানজানি বলেন-

> ইসলামের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দুদেশের মধ্যকার ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গভীর বন্ধন উভয় জাতির হৃদয়কে পরস্পর সংযুক্ত করেছে এবং আমাদেরকে এর ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করছে। বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য, যেমন কর্মঠ জনশক্তি, প্রাচুর্যময় প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থান, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিন্ন লক্ষ্য ও স্বার্থ প্রভৃতি বিষয়ে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোতমুখী সহযোগিতা সম্প্রসারণের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রনীতি ইসলামি ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিস্তারের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ভিত্তিতে আমরা দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং উভয় দেশের মাঝে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সমূহের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সব সময় নিজের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করছি। আমরা আশা করি যে, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন এ ক্ষেত্রে কার্যকর কাঠামো তৈরী করতে সক্ষম হবে।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্পষ্ট বিষয় হলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি যখন আমেরিকা বলয়ের দিকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, তখন ইসলামি প্রজাতন্ত্রে ইরান আমেরিকা থেকে বেরিয়ে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর,* (বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক: ১৯৭২-১৯৯৭) ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৩১।

২. মো: আবদুল হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৪২।

৩. মো: আবদুল হালিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩।

৪. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

৫. মো: আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।

৬. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

৭. কাজী জাহেদ ইকবাল, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭১-২০০১)*. জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৯।

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৯. মো: আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬।

১০. ড. আশফাক হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, নিউ এজ, ২০১৪, পৃ. ৩৯০।

১১. ড. আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

১২. *বিচিত্রা*, ২০ এপ্রিল, ১৯৭৩, পৃ. ৭।

১৩. মো: আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।

১৪. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২। (*The Government of Bangladesh, Ministry of Law The Constitution of the peoples Repubmic of Bangtladesh,* 28 February, 1979.)

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২ (শেখ আব্দুর রশিদ, *যুগপরিক্রমায় বাংলাদেশের সংবিধান*, সিটি প্রকাশনি, ঢাকা, ১৯৯৪, পাতা, ৮১)।

১৮. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪০৫-৪০৬।

১৯. কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৭-৮।

২২. ড. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*।

২৩. তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

২৪. ড. আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯১।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

২৬. ড. আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯২।

২৭. কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

২৮. কাজী জাহেদ ইবকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

২৯. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, (*ইরান ইরাক যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা*), সংখ্যা ৩১-৩২, ঢা. বি. ২০০৯, পৃ. ৫৪৩।

৩০. কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

৩২. ড. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

৩৫. Dilara Choudhury, *Bangladesh Foreign Policy outlook: Religional and International Settings in Bangladesh, South Asia and the World,* ed. Emajuddin Ahamed and Abul kalam (Dhaka: Academic Publishers, 1992), P. 53.

৩৬. Sabiha Hasan, *Foreign Policy of Bangladesh-II*, Pakistan Horizon, Vol. XXXVI, No. 4, 1983, P. 66.

৩৭. Imtiaz Ahmed, "A Projection of the Eynamism of Bangladesh-United States Relations" Mohammad Mohabbat Khan adn Syed Anwar Husain (eds.), Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy (University of Dhaka, Centre for Administrative Studies, 1986), P. 202.

৩৮. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৫৮।

৩৯. Muhammad Shamsul Haq, *Bangladesh in International Politics,* Dhaka, The University Press Ltd., 1993, P. 43.

৪০. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭।

৪১. কাজী জাহেদ ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৪২. এম এ কাউসার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

৪৩. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৮।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৪৫. Kennth Katzman, *Iran's Foreign Policy*, Congressional Research Service, June 30, 2015, p. 02.

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. *Ibid,* p. 03.

৪৭. *Ibid,* p. 03.

৪৮. Mansoor Limba (Translated), The Institute for Compilation and Publication of Imam KomeinI's Works (International Affairs Department) (*The Islamic State as a Global State*), 2006, P. 175-176.

৪৯. Mansoor Limba (Translated), *Ibid,*(*Principles and Fundamentals of Islamic Diplomecy From Imam khomeinis Viewpoint*), P. 22.

৫০. Mansoor Limba (Translated), *Ibid,* (*A Discussion on the Relationship between the Islamic Republic of Iran and the Muslim World*), P. 70.

৫১. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, মার্চ, ১৯৯২, পৃ. ২৬।

৫২. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ১৬ ও ৪৭।

৫৩. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব: তুরুস্ক-ইরান-আফগানিস্তান*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১৫৭।

৫৪. নূর হোসেন মজিদী (অনূদীত), *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দপ্তরের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৪।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

৫৭. *নিউজ লেটার*, ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৯১, *পৃ. ৫১*।

৫৮. ড. তারেক মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, *ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১।

৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৬০. Mansoor Limba (Translated), *Ibid,* (*Theoritical Viewpoints of Imam Khomeini in the Realm of Foreign Policy*), 2006, P. 72.

৬১. *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত; ৩৬তম বর্ষ, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ২৩।

৬২. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৭৪।

৬৩. ড. তারেক মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

৬৪. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের রাজনীতি ও বাংলাদেশের ভূমিকা

১. ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

২. ইরান-ইরাক যুদ্ধের (১৯৮০-১৯৮৮ খ্রি.) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৩. ইরান-ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-১৯৯০খ্রি.) বাংলাদেশের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের রাজনীতি ও বাংলাদেশের ভূমিকা

১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিশৃংখলা, অস্থিতিশীলতা ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাগণ পাহাড়সম সমস্যায় নিমজ্জিত হন। তদুপরি ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এ পর্যায়ে ইরাকের সাথে যুদ্ধের মোকাবিলার সক্ষমতা থাকলেও বিশ্বনেতৃবৃন্দের একচেটিয়া মনোভাব ও মুসলিম বিশ্বের ইরাক প্রীতির কারণে জয় ব্যতিরিকে অন্য কিছুই চিন্তা করেনি। আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিপ্লব পরবর্তী শাসন ব্যবস্থা, ইরান-ইরাক যুদ্ধ ও মুসলিম দেশ হিসেবে উক্ত যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

১. ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের অভ্যন্তরীন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসলামি বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পর ইরানের বিপ্লবী জনগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। বিজয়ের শুরু থেকেই বিপ্লবের বিরুদ্ধে পরাশক্তিবর্গ সীমাহীন শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। অসংখ্য ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্র হিসেবে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের রাজনীতিবিদ ও সচেতন গোষ্ঠি ইরানের শাসন প্রক্রিয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এ সময়কালে সংগঠিত ঘটনাগুলো নিম্নরূপ-

> ইমামের পরে সবচেয়ে বড় ইসলামি চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ মোতাহহারিকে হত্যা করে, ইমামের পরে প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ তালেকানিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে ইমামের প্রিয় শিষ্য প্রধান বিচারপতি আয়তুল্লাহ বেহেশতীসহ ৭৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করে। আরেক বিষ্ফোরণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট রাজায়ী ও প্রধানমন্ত্রী বাহোনারকে হত্যা করে। বর্তমান নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেইনীকে হত্যার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং আমেরিকার ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত ইরানি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদরাশি আটক করে, ইরাকের মাধ্যমে ইরানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, কুর্দিস্তানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, মাদকদ্রব্য বিস্তারের ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১]

বিপ্লব পরবর্তী ইরানে এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় যা বিপ্লবকে একটি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করে দেয়। ১৯৭৯ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইরানের শাসন ব্যবস্থায় পাঁচটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম পর্যায়: ইসলামি বিপ্লবের বিজয় থেকে অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ কাল।

দ্বিতীয় পর্যায়: অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ শুরুর পূর্বকাল।

তৃতীয় পর্যায়: যুদ্ধের সূচনা থেকে আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ পর্যন্ত সময়কাল।

চতুর্থ পর্যায়: আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ থেকে ইমাম খোমেইনী (রহ.) এর ইন্তেকাল ও আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর নেতৃত্ব লাভ।

পঞ্চম পর্যায়: আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর নেতৃত্বের যুগ। উপর্যুক্ত পর্যায়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

প্রথম পর্যায়: ইসলামি বিপ্লবের বিজয় থেকে অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ কাল।

ইমাম খোমেইনী (রহ.) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তার ঘোষণা অনুযায়ী ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে জারীকৃত এক আদেশে ড. মেহেদী বাযারগানকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তার আদেশবলেই এ অস্থায়ী সরকার বৈধতা লাভ করে। এ সরকারকে দেশ শাসন ছাড়াও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার লক্ষ্যে গণভোট অনুষ্ঠান এবং নতুন শাসন ব্যবস্থাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পরিষদ নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের সাথে সাথে বাযারগানের সরকার অস্থায়ী ইসলামি বিপ্লবী সরকার হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী এক ভাষণে তিনি সকল কর্মচারিকে ধর্মঘট ত্যাগ করে কাজে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। উক্ত সময়ে বাযারগান সরকারের ওপরে ছিল ইসলামি বিপ্লবী পরিষদের স্থান। ইমাম খোমেইনী (রহ.) বিপ্লবের নেতা হিসেবে বিপ্লবী পরিষদ ও অস্থায়ী সরকার উভয়ের উপর নজরদারী করেন। বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক পূর্বতন শাসনের সাথে যুক্ত বহু লোককে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে থাকে। এ ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৬ এপ্রিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী করীম সাঞ্জাবি পদত্যাগ করেন।[২] ইরানে ইসলামি বিপ্লবকালীন সময়ে তেল রফতানি স্থগিত ও অবিরাম ধর্মঘটের ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার পুরোপুরি শূন্যের কোটায় পৌছে। তদুপরি শাহের সময় দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচালনাকার্যে যেসব বিদেশী উপদেষ্টা ছিল তাদের সকলকেই বহিষ্কার করার কারণে বাযারগান সরকারের পক্ষে দেশ চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। শাহ সরকারের নেতৃবৃন্দ দেশ থেকে পালানো অথবা গ্রেফতার হওয়ার কারণে নতুন সরকারের দায়িত্ব ছিল দেশের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.) 'র নির্দেশে ইসলামি বিপ্লবী কমিটি নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ কমিটির মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র যুবকগণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য শাহি সরকারের অপরাধী কর্তাব্যক্তিদের গ্রেফতারের দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৩]

৩০ মার্চ ১৯৭৯ সালে ইরানে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' প্রশ্নে গণভোটে অংশ গ্রহণকারীদের শতকরা ৯৮% "হাঁ" সূচক ভোট প্রদান করে। ১ এপ্রিল গণভোটের রায় ঘোষণার মাধ্যমে রাজতন্ত্র ইরানের পরিবর্তে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান' ঘোষণা করা হয় এবং এ দিনটিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র দিবস নামকরণ করা হয়।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

৪ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.) অনুসারী বিপ্লবী ছাত্ররা গোয়েন্দাগিরির আখড়া নামে সুপরিচিত তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে। ভয়েজ অব আমেরিকার বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়, ৫ জন মহিলাসহ ৩৮ জন আমেরিকানকে জিম্মি হিসেবে আটক করে। রয়টার জানায়, হাঙ্গামা কারীরা মার্কিন দূতাবাস ভবনের অভ্যন্তরে ফাইলপত্রও তছনছ করেছে। তারা নিজেদেরকে ইমাম খোমেনীর অনুসারী বলে জানায়।[৫] আমেরিকা শাহকে বিচারের জন্য ইরানের নিকট সমর্পণ না করা পর্যন্ত জিম্মিদের মুক্তি না দেয়ার ঘোষণা দেয়।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে খসড়া সংবিধান গণভোটে দেয়া হয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধান অনুমোদিত হয়।[৬] নতুন এ সংবিধানের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে এ বি এম হোসেন বলেন-

> সরাসরি ভোটে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা বলা হয়। প্রেসিডেন্ট তার মনোনীত একজনকে তার প্রধানমন্ত্রী করবেন। অন্য ধারায় একক বিশিষ্ট একটি সংসদ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে বলে উল্লেখিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান সমুহের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ১২ সদস্যের একটি তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের (Council of Guardian) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে বলে নির্ধারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই তত্ত্বাবধায়ক পরিষদই রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ কর্তৃক সংসদে পাশকৃত সমুদয় আইন ইসলামের সাথে সঙ্গতি কিনা তা বিবেচনা করবে। বিবেচিত না হলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। বিধিতে *ভিলায়াত-ই-ফকিহ* বা সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতৃত্বের পদ সৃষ্টি করা হয়।[৭]

ইরানে নতুন শাসন ব্যবস্থার শুরু থেকেই সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, চরম পন্থী ও গেরিলা সংগঠন তৎপর হয়ে ওঠে। এদের মাঝে ফেদাইয়ানে খাল্‌ক (মার্ক্সবাদি), হেযবে তুদেহ (রাশিয়া সমর্থিত বামপন্থি দল), এবং মুজাহিদীনে খালক সহ আরো কয়েকটি দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। তাঁরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং বইপুস্তক লিখে ইসলাম, ইসলামি বিপ্লব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গুজব রটনা ও প্রচারণা চালাতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে ইমাম খোমেইনী (রহ.) বামপন্থিদের ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

দিলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে তেহরানে বামপন্থিগণ এক বিশাল মিছিল বের করে উক্ত মিছিলে শাহের স্বৈরতন্ত্রের স্থানে ধর্মান্ধদের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে শ্লোগান দেয়।[৮] অতপর তারা অস্ত্র ধারণ করে বিপ্লবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ড শুরু করে। এসময় 'ফোরকান' নামক গেরিলাগোষ্ঠী হুজ্জাতুল ইসলাম হাশেমী রাফসানজানীকেও হত্যার চেষ্টা করে। এসকল বিপ্লব বিরোধী গোষ্ঠী খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে গণ অসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষকদের ফসলের পালায় অগ্নিসংযোগ করে এবং তেলের পাইপ-লাইনে বিস্ফোরণ ঘটায়।[৯] এ ভাবেই বিপ্লবোত্তর সময়ে বামপন্থি, গেরিলা গোষ্ঠি ও ইসলামের শত্রুরা ইরানে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কিন্তু ইমাম খোমেইনী'র বিচক্ষণতায় এসকল ষড়যন্ত্রকে সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হন।

ইসলামি বিপ্লব বিজয়ের পর ইমাম খোমেইনী (রহ.) ও ইসলামি বিপ্লবী পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অস্থায়ী বাযারগান সরকারের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্যের কারণে ১৯৭৯ সালের ৬ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বাজারগান পদত্যাগ করেয়।[১০] বাজারগান পদত্যাগ করার ইরানের বিপ্লবী কাউন্সিল ক্ষমতা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ইরান শক্তিশালী সাংবিধানিক কাঠামোতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রবেশ করে। ইরানে এ পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে John D. Stempel, *Inside The Iranian Revolution* গ্রন্থে বলেন-

> Prime minister Bazargan's resignation, two days after the capture of the embassy, triggered the final round of the constitutional struggle. The Revolutionary council assumed control and the radical forces around Khomeini used the opportunity to Iram an Islam fundamentalist constitution through the assembly and thus gain complete power.[১১]

Dhaka University Institutional Repository

ইরানের অর্ন্তদ্বন্দ্বের এ পর্যায়ে ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইসলামি বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের কার্যক্রম আলোচনা করতে গিয়ে মাসেহ মুহাজিরি বলেন-

> The Islamic Revolutionary Guards Corps originates from the very same philosophy as the Islamic Revolution's leadership and people, while having trust and confidence in the Army, realized that the non-revolutionary spirit of a number of the difference and the penetration of the bureaucratic system into military agencies hindered it. Until the system of the Army was totally transformed, it was not expected that the Army function as a revolutionary army and fulfill the Revolution's military recuirments. Hence, the Guardian Corps was formed in March, 1979, that this just after the victory of the Revolution. In adding to maintaining peace and opposing counter revolutionaries, the IRGC works as a powerfull arm for the revolutionary Tribunals and hastens to the aid of the Army in preserving the country's independence and fighting foreign enemies.[১২]

মূলত ইরানের এই বিপ্লবী রক্ষিবাহিনীই পরবর্তীতে ইসলামি বিপ্লবকে সচেতনতার সাথে শক্তমূলে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগ থেকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ শুরুর পূর্বকাল

ড. মেহদি বাযারগানের অস্থায়ী সরকারের পদত্যাগের পর বিপ্লবী পরিষদ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিপ্লবী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর সংবিধান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করে। সংশোধিত সংবিধানটি বৎসরের শেষান্তে অনুমোদিত হলে ১৯৮০ সালের প্রারম্ভে আবুল হাসান বনি সদর (জ. ১৯৩৩ খ্রি.) ইসলামি রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন।[১৩] তিনি ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় তার ক্ষমতারোহনের পর ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখলেও তার কার্যক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ ভাব পরিলক্ষিত হয়। একারণে আলেম সমাজ ও বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর সাথে বিরোধের জের

Dhaka University Institutional Repository

ধরে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ১৯৮১ সালে অভিসংশিত হন। ইরান-ইরাক যুদ্ধকালীন অবস্থা ও ইরানের অস্থিতিশীল পরিবেশে প্রেসিডেন্টের অভিসংশনে ইরানে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাময়িক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম খোমেইনী (রহ.) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংস্থা'র নিকট একটি নির্দেশনা পাঠান। উক্ত নির্দেশনায় 'ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ভবিষ্যত সংস্কৃতির ধারা নির্ধারণ, দ্বীনদার, নিষ্ঠাবান ও সচেতন শিক্ষকমণ্ডলী নির্বাচন তৈরী এবং ইসলামের শিক্ষা-বিপ্লবের অন্যান্য বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।[১৪] ১৯৮২ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চালু হয়ে ইসলামি ব্যবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে তখন এতে সাধারণ শিক্ষার্থী ও মহিলারা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ বলে দৃশ্যমান হয়। ১৯৮৩ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রাক-বিপ্লব সময়ে ইরানে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্র-ছাত্রী ছিল ১৭,০০০ সেখানে বিপ্লবোত্তর কালে ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৪,৫০০তে কমে আসে। এবং ছাত্রীদের নিবন্ধিকরণ আরো হ্রাস পেয়ে ৪০% থেকে ১০% এ নেমে আসে।[১৫] শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামিকরণের কারণে পবরর্তীতে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রতি ব্যাপক গণজোয়ার অব্যাহত থাকে।

এ পর্যায়ের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আমেরিকার জিম্মি উদ্ধার মিশন। ১৯৮১ সালে আমেরিকা জিম্মি উদ্ধারের জন্য ইরানে এক অভিযান পরিচালনা করে। পারস্য উপসাগর থেকে বিমান ও হেলিকপ্টারযোগে মার্কিন সৈন্যরা ইরানে প্রবেশ করে রাতের মাঝেই তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়ে সেখান থেকে জিম্মিদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু মার্কিন সৈন্যদের অবতরণস্থল তাবাসে বালুঝড়ের কারণে আমেরিকার এ হামলা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, মার্কিন হেলিকপ্টারগুলোতে আগুন ধরে যায় ও তাদের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়।[১৬] এভাবেই ইরানে আমেরিকার জিম্মি উদ্ধার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে ইরানের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ঘটনা হল ইরাকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া। যদিও দীর্ঘদিন শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ইরানি জনগণ শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রকে সচলতার চাকায় দাঁড় করানোর চেষ্ঠা করছিল এমন সময়ে ইরাক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে বিকালে কয়েক ডজন ইরাকি জঙ্গী বিমান ইরানে হামলা চালায়। ইরাকি বিমানগুলো তেহরানের মেহেরাবাদ বিমানবন্দর ও ইরানের আরো কয়েকটি শহরের বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করে। একই সাথে ইরাকি স্থলবাহিনী ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খুযিস্তান, ইলাম, কুর্দিস্তান ও বাখ্তারানে হামলা চালায় এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইরানি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে থাকে। পরদিন ইরানের ১৪০ টি জঙ্গি বিমান বাগদাদসহ ইরাকের অন্যান্য শহরের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে বোমাবর্ষণ করে স্বদেশের প্রতিরক্ষা ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়।[১৭] এভাবেই ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু করে যা দীর্ঘ আট বছর অব্যাহত থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ঃ যুদ্ধের সূচনা থেকে আয়াতুল্লাহ খামেইনীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ পর্যন্ত সময়কাল

এ সময় ইরানে সবেমাত্র সশস্ত্র বাহিনী পুনঃর্গঠন শুরু হওয়ার কারণে একটি ব্যাপক ভিত্তিক যুদ্ধে যোগদানের মতো কোন প্রস্তুতিই তাদের ছিল না। বিপ্লব রক্ষী বাহিনীও ছিল একটি নবগঠিত বাহিনী। তাই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ধারণা করেছিলেন যে, ইসলামি বিপ্লবের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর বাহিনীকে তেহরানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে, অথবা কমপক্ষে খুযিস্তান প্রদেশ দখল করে ইরানকে তার তেল বিক্রির আয় থেকে বঞ্চিত করতে ও অচল করে দিতে পারবে।[১৮]

এ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী এবং বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি 'বাসিজ' নামে এক বিরাট ত্যাগী গণবাহিনী গড়ে ওঠে ও রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে ইরাকি বিমান ও সেনাবাহিনী ইরানি বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। এ ছাড়াও ইরানের শিল্প-কলকারখানা, তেল শোধনাগার, সেতু ও মহাসড়কগুলোতে বোমা ও ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকাও তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। এছাড়াও তারা ইরানের সীমান্তবর্তী শহরসমূহের হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষকে বন্দি করে।

ইরাকি বাহিনীর অগ্রাভিযান প্রায় এক মাস অব্যাহত থাকে। এ সময় পরাশক্তিবর্গের প্রভাবাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ নীরবতা অবলম্বন করে। কয়েক সপ্তাহ পর ইরাকি বাহিনীর অগ্রযাত্রা থেমে যায়। যুদ্ধের এ পর্যায়ে অস্ত্রবিরতির জন্য ইরানে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের আসা-যাওয়া শুরু হয়। কিন্তু ইরান ইরাকি বাহিনীর আন্তর্জাতিক সীমান্তে পশ্চাদাপসারণ ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

যুদ্ধকালীন সময়ে ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল মার্কিন জিম্মি সমস্যা। ইমাম খোমেইনী (রহ.) জিম্মিদের ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মজলিসে শূরার উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি চারটি শর্ত দিয়ে জিম্মি সমস্যার সমাধান করার জন্য আহ্বান জানান। শর্তগুলো হল-

a. Returning to Iran 24 Billion U.S Dollar of the Shah's wealth the Islamic regime belived he had amassed in America.
b. Formal apology by President Carter to the Iranian people for the mistakes and crimes America had perpetrated against the Iranian people in the past.
c. An assurance by the American Government that American companies and organizations which had been contracted for various development projects in Iran would not take legal action against Iran and demond compesation for annullment of their contracts.
d. A promise by the US government that it would not interfere in the internal affairs of Iran.[19]

Dhaka University Institutional Repository

আলজেরিয়া সরকার দুপক্ষের মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে প্রায় এক বছর পর মার্কিন জিম্মিদের নিম্নোক্ত শর্তে আলোচনায় অগ্রগতি হতে থাকে।

a. Returning the Shah to Iran and the Shah's wealth amounting 24 Billion U.S Dollar.
b. A Formal apology by Carter for the crimes committed by America in Iran.
c. An assurance to Iran that in future, America shall not interfere in Irans Internal affairs.
d. Affirming that American companies shall not file legal suits against Iran demonding financial compensation for cancelled contracts after the Revolution.[20]

উপরিউক্ত শর্তাবলী মেনে নেয়ার বিনিময়ে জিম্মিদের মুক্তি দেয়া হয়। রয়টারও এফ পির বরাত দিয়ে বলা হয়, দীর্ঘ ৪৪৪ দিন আটক থাকার পর ৫২ জন মার্কিন জিম্মির মুক্তি লাভে সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও সরকার পরম সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ২১ জানুয়ারি সকালে বিমান দুটি জ্বালানী গ্রহণের জন্য আলজিয়ার্সের হুয়াবি বুমেদিন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। পরে জার্মানির রেইন মেইল মার্কিন ঘাঁটি হতে প্রেরিত 'সি নাইন' বিমান জিম্মিদের তুলে নিয়ে জার্মানির উইজবেডেনে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক হাসপাতালে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভর্তি করে।[২১] এরই মাধ্যমে ইরানে মার্কিন জিম্মি নাটকের অবসান ঘটে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিগুলোর অপতৎপরতা থেমে থাকেনি। একদিকে ইরাকের বিরুদ্ধে ইরানের ব্যাপকভিত্তিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ অন্য দিকে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোষ্ঠিগুলো ক্ষমতার লোভে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরোধীতায় নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২৭ জুন ১৯৮১ সালে ইসলামি বিপ্লব বিরোধী বামপন্থিদল ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহ ইরানের জনসাধারণ ও বিপ্লবের প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গকে হত্যার জন্য অভিযান শুরু করে। প্রথমে তারা বোমা বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে হযরত আয়াতুল্লাহ খোমেইনীকে হত্যার চেষ্টা চালায়। ২৮ জুন ১৯৮১ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেইনী

Dhaka University Institutional Repository

যখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন এ সকল মুনাফিকরা তেহরানে ইসলামিক রিপাবলিক দল এর সদর দফতরে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটায়। উক্ত বিস্ফোরণে বিচার বিভাগের প্রধান আয়াতুল্লাহ বেহেশতী এবং প্রধানমন্ত্রী রাজায়ীর মন্ত্রিসভার চারজন মন্ত্রী এবং ২৭ জন পার্লামেন্ট সদস্যসহ মোট ৭২ জন শাহাদাত বরণ করেন।[২২]

এর কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ আলী রাজায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ জাওয়াদ বহোনার প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। তেহরানে ইসলামিক রিপাবলিক দল এর সদর দফতরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের মাত্র দুমাসের মাথায় ৩০ আগস্ট ১৯৮১ সালে তারা আরেকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে থাকাকালে রাজায়ী ও বহোনারকে হত্যা করে। সাথে সাথে মজলিসের পক্ষ থেকে আয়াতুল্লাহ মাহ্দাভী কানীকে (অন্তর্বর্তীকালের জন্য) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয় যাতে দেশ শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার শূন্যতার সৃষ্টি না হয়।[২৩]

উপরিউক্ত কয়েকটি ঘটনা ইরানের ইসলামি বিপ্লবের ইতিহাসের কঠিনতম সময় বলে অভিহিত করা চলে। রাজায়ী বাহোনারের মৃত্যুর এক মাস পরে ইরানি জনগণ তৃতীয় বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেন। উক্ত নির্বাচনে আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেইনী ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

চতুর্থ পর্যায়: আয়াতুল্লাহ খামেইনীর প্রেসিডেন্ট পদ লাভ থেকে ইমাম খোমেইনী (রহ.) মৃত্যু সময়কাল

আয়াতুল্লাহ খামেইনী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পর তিনি ইঞ্জিনিয়ার মীর হোসেন মুসাভীকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করেন। তার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা মজলিস (পার্লামেন্ট) এর আস্থাভোট লাভ করে। এ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রবেশ করে এবং পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় এক ধরণের স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। চলমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বিপ্লব বান্ধব সরকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনের কারণে ইসলামি নেতৃবৃন্দ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাশাপাশি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত ইরাকের সাথে যুদ্ধে চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

আয়াতুল্লাহ খামেইনী প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পর ইরানের এ অধ্যায়ের শুরুতে ক্ষুদ্র গোষ্ঠিসমূহ, বামপন্থি দলগুলো পূর্বের ন্যায়ই ষড়যন্ত্র, বোমা বিষ্ফোরণ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসাধারণ ও বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে হত্যা এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

১৯৮৫ সালে মজলিসে শূরায়ে ইসলামি (পার্লামেন্ট) এর দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আয়াতুল্লাহ খামেইনী প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃনির্বাচিত হন। তিনি মীর হোসেন মুসাভীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন এবং মজলিস (পার্লামেন্ট) তা অনুমোদন করে।[২৪]

এ পর্যায়ের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ১৯৮৮ সালে হজ্বের সময়ে ইরানের হাজীগণ আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে। সৌদি সরকার হাজীদের বিক্ষোভ মিছিলে ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকশ হাজিকে হত্যা করে। সৌদি সরকারের এ আচরণে হাজিদের মাঝে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে নিন্দার ঝড় ওঠে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সৌদি সরকারের আমেরিকা প্রীতির প্রকৃত চেহারা উম্মোচিত হয়।

এ পর্যায়ের একটি অন্যতম ঘটনা হলো ইমাম খোমেইনীর একটি ফতোয়া দান। ভারতীয় বংশোদ্ভুত বৃটিশ নাগরিক সালমান রুশদী বাহ্যত মুসলমান ছিল। কিন্তু তার লিখিত '*স্যাটানিক ভার্সেস*' গ্রন্থে ইসলামের পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ও রাসুলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবমাননা করা হয়। ইমাম খোমেইনী (রহ.) তাকে হত্যা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ইমামের এ ফতোয়া সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ইরানের মজলিসে শূরায়ে ইসলামি বৃটেনকে এক চরমপত্র প্রদান করে এবং তার ভিত্তিতে ইরান ও বৃটেনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৯ সালের ৩ জুন রাত ১০.২০ ঘটিকায় হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.) ৮৭ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।[২৬] হযরত ইমামের কনিষ্ট পুত্র হাজী আগা সাইয়েদ আহমাদ খোমেইনী ইন্তেকালের খবর ইরানি জনগণ ও বিশ্বের মুসলমানদের সামনে ঘোষণা করেন। ইমামের ইন্তেকালের পর পরই নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদ অধিবেশনে বসে এবং এক দিনেরও কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাক্ওয়া, ইজতিহাদ, সচেতনতা, চিন্তাধারার গভীরতা, ইমামের কর্মনীতি ও কর্মধারা অনুসরণ, বিপ্লবের রাস্তায় সংগ্রামী তৎপরতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার বিচারে যোগ্যতম বিবেচিত হওয়ায় হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেইনীকে দেশের নেতা নির্বাচিত করে।[২৭]

ইরান ইরাক যুদ্ধে ইরাকের বিপর্যয় দেখে আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ পারস্য উপসাগরে শতাধিক যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরান-ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে তার ৫৯৮ নং প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবে উভয় পক্ষকে নিজ নিজ সীমান্তে পশ্চাদাপসারণ এবং যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানানো হয়। পারস্য উপসাগরে পশ্চিমা বাহিনীসমূহ ও মার্কিন রণতরীর উপস্থিতির ফলে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতির মোকাবেলায় ইরান নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ নং প্রস্তাব মেনে নেয় এবং যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবার কথা ঘোষণা করে।

১৯৮৮ সালের ২০ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ইরান-ইরাকের দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর যুদ্ধ চলার পর তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য পুরো ইরান-ইরাক সীমান্ত জুড়ে জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকগণ অবস্থান গ্রহণ করেন।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পর্যায়ঃ আয়াতুল্লাহ্ খামেইনীর নেতৃত্বের যুগ

ইমাম খোমেইনীর (রহ.) মৃত্যুর পর হযরত আয়াতুল্লাহ খামেইনীর নেতৃত্বের যুগ শুরু হয় যা বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যায়ে ইরান প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ করে। ইমাম খোমেইনী (রহ.) জীবিতাবস্থায় প্রণীত সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর গণভোট দেয়া হয়। উক্ত গণভোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে প্রেসিডেন্টকে সরকার প্রধান করা হয়। ১৯৮৯ সালে সংবিধান সংশোধনীর গণভোটের পাশাপাশি একই সাথে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে মজলিসের (পার্লামেন্ট) স্পিকার হুজ্জাতুল ইসলাম আলী আকবর হাশেমী রফসানজানি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

রফসানজানি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর পরই মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক ও কুয়েত সমস্যা দেখা দেয়ার কারণে ইরাক ইরানের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নীতি গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে ইরান ও ইরাকি যুদ্ধ বন্দি বিনিময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ ও পত্র বিনিময় হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকে বন্দি ইরানি সৈন্যদের প্রথম দলটি স্বদেশে ফিরে আসার জবাবে ইরানের পক্ষ খেকে ইরাকি বন্দিদের মুক্তি দান শুরু হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উভয় দেশ প্রায় সকল বন্দিকেই মুক্তি দান করে।

পরবর্তীতে ইরাককে কুয়েত থেকে বিতাড়িত করার জন্যে যে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করা হয় তাতে যোগদানের জন্য ইরানকে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান অতীত আগ্রাসনের জবাবে ইরাকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের নিন্দার পাশাপাশি কুয়েত উদ্ধারের নামে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বাইরের শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপেরও নিন্দা করে। ইরান আলোচনার মাধ্যমে ইরাক-কুয়েত বিরোধ নিস্পত্তির যে চেষ্টা চালায় তা সফল না হলেও ইরানের এ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধোত্তর ইরান একটি নতুন সংগ্রামের চ্যালেঞ্জ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাহল যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ও পুনর্গঠনের সংগ্রাম। দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী যুদ্ধে হাজার হাজার লোক নিহত ও আহত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে বহু শহর-গ্রাম-জনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, শিল্প-কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। বিশ্বগ্রাসী আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোর ষড়যন্ত্র ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে আয়াতুল্লাহ খোমেইনীর নেতৃত্বে ইরান উন্নত বিশ্বে পরিণত হচ্ছে। এতে ইরান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক সহ প্রায় সকল সূচকেই শক্ত ভীতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. ইরান-ইরাক যুদ্ধের (১৯৮০-১৯৮৮ সাল) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নব্বই দশকে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরান-ইরাক যুদ্ধ পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তোলে। সদ্য ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও তার মিত্ররা ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধের আয়োজন করে। আরব, পারসিক, শিয়া ও সুন্নি মতবাদ এবং ইরানের সাথে ইরাকের সীমান্ত সমস্যার মাধ্যমে যুদ্ধ সংঘঠিত হলেও উভয় দেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধে কোন দেশই তেমন লাভবান হতে পারেনি। কিন্তু তাদের দীর্ঘমেয়াদি হত্যা নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ দুটি দেশকেই দুর্বল করে তোলে। নিম্নে এ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ইরান-ইরাক যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা উপস্থাপন করা হল-

কুর্দি সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করার কারণে দুদেশের মাঝে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে অবনতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৯ সালে ইরান সমালোচনা পূর্বক অভিযোগ আনে যে, ১৯৩৭ সালের 'শাত-ইল-আরব'[২৯] চুক্তির কয়েকটি ধারা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে আলজেরিয়ায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে 'নিষ্পত্তিমূলক চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র শাত-ইল-আরব

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্তে 'থলওয়েগ রেখা' দুই দেশের সীমানা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধ মূলত ঐতিহাসিক আরব-পারসিক বিবাদ।[৩০]

মূলত ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর ইসলাম ও ইরানের শত্রুরা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় লেবাননে ইরাকের রাষ্ট্রদূত উক্ত বছরের অক্টোবর মাসে একটি দাবী উত্থাপন করেন। সেটি হলো ১৯৭৫ সালে ইরান ও ইরাকের চুক্তি বাতিল, ইরানের বেলুচ, কুর্দি ও আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বায়ত্তশাসন এবং ১৯৭১ সালের দখলকৃত আবু মুসা ও তানব দ্বীপসমূহ প্রত্যার্পণ। উক্ত বছরের ডিসেম্বর মাসে ইরান অভিযোগ করে যে, ইরাকি বাহিনী কয়েকবার ইরানের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। এ সকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে উভয় দেশের রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে নেয়। এ যুদ্ধের অন্যতম কারণ আলোচনা করতে গিয়ে এম এস আল আযহারি বলেন-

> A new dimension had therefore been added to the original contradiction between Arab and Persian nationalism: The Sunni–Shi'a antagonism. In that context, adherence to divergent branches of Islam proved less significant then the differing digree of influence exerted by religion on the formation and appreciation of politics and state power. That condition still prevails today, particularly in those states in which an Arab population is divided into Sunni and Shia.[31]

১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদি এক পত্রে উপসাগরীয় দ্বীপ সমূহ ইরাকের কাছে হস্তান্তর করার জন্য ইরানের প্রতি চাপ প্রয়োগ করার আহ্বানে ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদিক কুতুবজাদেহ ইরাককে পশ্চিমা শক্তির ইন্ধনের কথা উল্লেখ করেন। Parviz Daneshvar বলেন-

> United States, encouraged Saddam Hossain of Iraq wage war against the revolutionary regime of Khomini, not only to please his new allies but to

Dhaka University Institutional Repository

fullfil his flong-awaited ambition of annxing the wealthy Khuzestan Province.[32]

এ সময়েই ইরানের একটি তেল রক্ষণাগারে অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং আবাদান তেল শোধনাগারে এক বিস্ফোরণে তেল ও গ্যাসের একটি পাইপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইরান ইরাককে দায়ি করে। ইরান ইরাক যুদ্ধের অন্যতম দুইটি কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে Sepehr Zabin বলেন-

> First, in the last few years of the Shah's regime the two countries had managed to normalize their relations. Outstanding issues such as Sovereignty over Shat-al-arab, the damarcation of boundaries and the relation of each government. Towords the Kurdish people with in their territories were all resolved in the historic Algiers agreement signed in 1975. As for as the new regime concerened Iraq was a pro-Shah regime, and since it was determind to reverse the basic premises of the Shah's foreign policy, it was obvious that sooner or later Iraq's Bathist regime would be placed on Khomeinis enimy list.
>
> Secondly, the Iraqi's too felt strong reasons for suspicion and increased enemity toward the new Iran, which was not only espousing an international dimension for its Islamic revolution, but displaying strong hostility towards the Bathist regime a Secular and, not the least, deologically pro-western.[33]

এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে ইমাম খোমেইনী (রহ.) কর্তৃক সাদ্দাম হোসেনকে 'ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু' ঘোষণা করে ইরানের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার ঘোষণায় যুদ্ধের ধামামা বেজে উঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক সরকার হাজার হাজার ইরাকি শিয়া ও কুর্দিদের বহিষ্কার করার কারণে তারা ইরানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালের ৬ জুলাই ইরাক ও ইরানের সীমান্তের কয়েকস্থানে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয় উক্ত সংঘর্ষে ইরাক বিমান বাহিনীকে ব্যবহার করে। এবং উক্ত মাসেই ইরাকের প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ভাষায় মন্তব্য করেন। তার এ মন্তব্যের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত *A Review of The Imposed War* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> Long before unleshing an aggressive war against Iran, the Iraqi regime was preparing a plan to overthrow the Islamic regime in Iran. The intension was transparent in the statements and comments made by Saddam and his aides. Said Saddam is an interview with foreign corrospondents in July 1980, touching on relation with Iran Our relation with Iran is bad, therefore, you should not expect that he is at one with Iraq in opposing Iran, we should reject him! We welcome all and do not reject them, but respond to their causes.[34]

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে ইরাকের সংসদে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ১৯৭৫ সালে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকি কর্তৃপক্ষ ২০ সেপ্টেম্বর প্রচারিত এক বিবৃতিতে ঘোষণা করে যে, ১৯৭৫ সালে আলজিয়ার্স চুক্তি বাতিলের মধ্য দিয়ে শাত-ইল-আরব আবার পুনঃরায় ইরাকের এলাকা হিসেবে মর্যাদা পেল।[৩৫] এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ইরান-ইরাক সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের সূচনার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত *A Review of The Imposed War* গ্রন্থে বলা হয়-

> On September 22, 1980, The Iraqi regime embarked on an invasion of the territory of the Islamic Republic of Iran, and by air-raiding the International and Internal airport of Iran; turned its invasion into an all out attack against our country. During the early days of the war, ten important border cities of Iran, namely Khorramshahr, Soussangerd, Bostan, Mehran, Dehtoran, Qasr-shirin, Hoveizeh, Naft Shahr, Soumar and Moussain were occupied, whoile other cities like Abadan, Ahwaz, Dezful, Shoushtar, Andomesk,

Dhaka University Institutional Repository

Islamabad Gharb and Gilan Gharb were repetedly shelled by the Iraqi artilary.[36]

অন্যদিকে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্য এ যুদ্ধে আমেরিকা পরোক্ষ সমর্থন দিতে থাকে। ইরান-ইরাক যুদ্ধে মার্কিন স্ট্রাটেজি আলোচনা করতে গিয়ে *ইসলামি বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ* গ্রন্থে লেখক বলেন-

তৃতীয় বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র তার আধিপত্যবাদী ও ঔপনিবেশিক নীতি প্রয়োগ করে তিনটি উপায়ে,

১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে অত্যন্ত অল্প দামে কাঁচামাল আমদানি করে।

২. তৃতীয় বিশ্বে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পণ্য রপ্তানী করে।

৩. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগের মাধ্যম।

শেষোক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ সমস্ত দেশে অর্থ বিনিয়োগ করে যেখানে 'আইন শৃঙ্খলা' রয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যায় টাইমস লিখে, 'ইসলামি বিপ্লবের আগমন এই 'আইন শৃঙ্খলা'র মূলোৎপাটন করে একটি সামাজিক তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে যা বিশ্বের শোষক-ত্রাসক শক্তিগুলোকে উৎখাত করতে সক্ষম।[৩৭]

১৯৮০ সালের ৬ জুলাই সীমান্তে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মাঝেই ইরান-ইরাক যুদ্ধের সূচনা হয়। এ যুদ্ধের সূচনার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে মোঃ ফায়েক উজ্জামান বলেন-

ইরাকের আলজিয়ার্স চুক্তি বাতিল ইরান-ইরাক সম্পর্ককে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। দুই দেশের মধ্যে তীব্র সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শাত-ইল-আরবে ইরান ও ইরাকি সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ইরানের দুটো জঙ্গি বিমান বিধ্বস্ত হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বনি সদর ইরানি সমস্ত সংরক্ষিত সেনাবাহিনীকে একত্রিত করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। ২০ সেপ্টেম্বর দুই পক্ষই শাত-ইল-আরবে তুমুল সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করে। ইরাক ইরানের খোররম শহরে এবং ইরান ইরাকের বসরা শহরে বিমান হামলার জন্য একে অপরকে দায়ী করে।[৩৮]

যুদ্ধের শুরুর প্রাক্কালে এক জরিপে দেখা যায় যে, ইরান হতে অনেকাংশে দুর্বল রাষ্ট্র ইরাক শুধু বিদেশীদের প্ররোচনায় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। নিম্নে তৎকালীন ইরান ও ইরাকে সামরিক সক্ষমতার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

ক) বিপ্লবের ফলে ইরানের সৈন্যবাহিনী ৪ লক্ষ ৪০ হাজারে নামে আসে। ইরাকের সেনাবাহিনী ২ লক্ষের বেশী ছিল।

খ) যুদ্ধের প্রাক্কালে ইরানের ছিল ব্রিটিশ নির্মিত ১১২৫ 'চীফটেন' ও 'স্করফিয়ন' ট্যাংক এবং আরো কিছু মার্কিন নির্মিত 'এম-৬০' সহ কিছু সংখ্যক মাঝারি ধরনের ট্যাংক। ইরাকের ছিল রাশিয়া নির্মিত ২৭০০ 'টি-৩৪', 'টি-৬২' ও 'টি-৭২' ট্যাংক এবং ১০০ টি ফ্রান্স নির্মিত 'এ এম এক্স' ট্যাংক।

গ) যদিও ইরানের ৪৪৫ টি মার্কিন 'এফ-৪', 'এফ-৫' ও 'এফ-১৪' জঙ্গি ও বোমারু বিমান ছিল, বিপ্লবের ফলে এর ৪০ হতে ৩০ শতাংশ মাত্র ব্যবহার যোগ্য ছিল। পক্ষান্তরে ২৩০ টি সোভিয়েট 'মিগ-২১' ও 'মিগ-২৩' সহ ইরাকের জঙ্গি ও বোমারু বিমানের সংখ্যা ছিল ৩২২।

ঘ) ইরানের নৌবাহিনী ইরাকি নৌবাহিনী অপেক্ষা অন্তত পাঁচগুণ বৃহৎ ছিল।

ঙ) দুই দেশেরই 'ভূমি হইতে আকাশ' শ্রেণির ক্ষেপণাস্ত্র ছিল।[৩৯]

ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরানের চাইতে অর্থনৈতিকভাবে ইরাক মুষড়ে পড়ে বেশী। যুদ্ধের পূর্বে ইরাক ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে দৈনিক তেল উত্তোলন ছিল ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) হাজার ব্যারেল সেখানে যুদ্ধের দুই বছরের মাথায় ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে দৈনিক তেল উত্তোলনের পরিমাণ কমে ৮০০ (আটশত) হাজার ব্যারেল। অন্যদিকে ইরানের বিপ্লব পরবর্তী তেল নির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে গিয়ে উৎপাদনমূখী অর্থনীতিতে নির্ভরতা বেড়ে যায়। ফলে ইরান বিপ্লবের পূর্বে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে যেখানে দৈনিক তেল উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৫,৮৪৮ হাজার ব্যারেল, যুদ্ধের দুই বছর পর ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে তা কমে ২৭৫০ হাজার ব্যারেলে পৌছায়।[৪০]

যুদ্ধের প্রভাবে ইরাকের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইরাক যুদ্ধের পূর্বে ১৯৮০ সালে আমদানি করেছিল ১৩৯২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য, সেখানে ইরান উক্ত বছরে আমদানি করে ১২৯৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। যুদ্ধ পরবর্তী এক বছরে ইরানের আমদানি পণ্যের ব্যয় কমে ১৯৮১ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ১২৬৩৬ মিলিয়ন ডলারে। অন্যদিকে ইরাকের আমদানি ব্যয় বেড়ে ১৯৮১ সালে দাঁড়ায় ১৮৯০৭ মিলিয়ন মার্কিন

Dhaka University Institutional Repository

ডলারে।[৪১] ১৯৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি ইরানকে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্তি করে এবং ইরানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন স্টানচ' নামে বিদেশি অস্ত্র ইরানে বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[৪২]

ইরাক পাশ্চাত্য শক্তির ষড়যন্ত্রে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী এবং যুদ্ধের প্রথম দিকে ইরাকের জয় পরিলক্ষিত হলেও ইরাকের যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। ইরাকের রণকৌশলের প্রাথমিক লক্ষ্য অনুযায়ী সমগ্র খুজিস্তান দখল করে ইরানের ওপর এমন চাপ প্রয়োগ করা যাতে ইরান 'শাত-ইল-আরব' এর পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ইরাকের সীমানা হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু ইরাক তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে ইরান ইসলামি বিপ্লবোত্তর সময়ে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত অবস্থান শক্ত করতে না পারলেও ১৯৮১ সালে ইরান সংগঠিতভাবে ইরাকের দখলিকৃত অঞ্চলের উপর পুনঃদখলের অভিযান চালায়। এতে ইরাকের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৮২ সালের মে মাসে উক্ত দখলিকৃত এলাকা আয়ত্তে আনে। এ সময়েই শাত-ইল-আরব পাড়ি দিয়ে ইরাকের অভ্যন্তরে আক্রমণ করে ও কিছু অংশ দখল করে। উক্ত দখলিকৃত এলাকায় ইরানি বাহিনী ইরাকের বিমান বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়ে পুনরায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দুই দেশ তাদের স্বীয় অবস্থানে থেকে প্রতিপক্ষের ওপর বিমান হামলা ও ধ্বংসাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। এতে করে উভয় দেশের বাহ্যিক ক্ষয় ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণ চোখে পড়েনি। উনবিংশ শতাব্দীর ক্রাইমিয়ার যুদ্ধকে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধে তা অপেক্ষা অধিকতর অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়।[৪৩]

৩. ইরান-ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-১৯৮৮ সাল) বাংলাদেশের অবস্থান

উপসাগরীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পুরা মুসলিম বিশ্ব ছিল ত্রিধাবিভক্ত। এক পক্ষ ইরানকে, অপর পক্ষ ইরাককে ও তৃতীয় পক্ষ মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে কোন দেশের পক্ষে অবস্থান নেয়নি। এ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয় ভাগে। শিয়া-সুন্নি সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

যদিও যুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ ছিল তদুপরি বাংলাদেশের জনগণ সুন্নি হওয়ায় মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এ দেশের জনগণের মৌন সমর্থন ছিল ইরাকের প্রতি। এছাড়াও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী হিসেবে আরব ও মুসলিম বিশ্বের প্রথম দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের কাছে ইরাকের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের জিয়াউর রহমান সরকার মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক কূটনীতি গ্রহণ করে এবং দুদেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে সমঝোতার আলোচনা ও ভ্রাতৃঘাতি দুই দেশের সংঘাতের বিপক্ষে কড়া সমালোচনার পাশাপাশি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান। নিম্নে ইরান-ইরাক যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল।

১৯৮০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ এ যুদ্ধকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত হিসেবে মূল্যায়ন পূর্বক কোন পক্ষকে সমর্থন না করে ও আই সি'র সদস্য হিসেবে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হিসেবে যুদ্ধ বন্ধ করার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক অবস্থা, ইরান ও ইরাকের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বৃহৎ শক্তির ভূমিকা, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি প্রশ্নে ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের এ নীতি গ্রহণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম কারণঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিজয় পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। ১৯৭৪-৭৫'র অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের পাশাপাশি আরব ও মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব কিছু মাথায় রেখে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় নীতি পরিবর্তনের এটিই ছিল প্রথম ব্যবস্থা।

শেখ মুজিবুর রহমান সরকার মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্কের যে দিগন্তের সূচনা করেছিল জিয়াউর রহমান সরকার সতর্ক কূটনীতির মাধ্যমে সে পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কারণ তাদের সাথে আমাদের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আছে।[৪৪] এ সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামি সংহতির লক্ষ্যে পৌছানো।

১৯৭৪ সালের লাহোরে অনুষ্ঠিত ও আই সি সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান এর শর্ত ছিল পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেনা। এ বিষয়টি মুসলিম বিশ্বে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দিগন্ত উম্মোচন করে। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত সমস্যাটির মধ্যস্থতা করেন।[৪৫] ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঢাকার নীতি পরিবর্তীত হতে থাকে। জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে আল্লাহর প্রতি অসীম আস্থা জুড়ে দেয়া হয়। এ সময় সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহীম' সংযোজন করা হয়। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে যেখানে দেশের বিদেশ নীতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেখানে নতুন ধারা যোগ করা হয় মুলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে।[৪৬]

১৯৭৮ সালে ডাকারের ও আই সি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলেন থেকে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদের জন্য মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন পায়। আল-কুদস কমিটির সদস্য পদ লাভ করে। স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ডের। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সেখানে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানির সুযোগ দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। সম্পর্কটি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে যেখানে সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৭৬৪ মিলিয়ন ডলার সেখানে ৮০'র দশকের শুরুতে দাঁড়ায় ৪ হাজার মিলিয়ন ডলারে। দাতা ছিল ১৯ টি আরবদেশ ও ইরান।[৪৭] মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের এ সময়ে যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ ভারসাম্যমূলক নীতিকেই প্রাধান্য দেয়। পরবর্তীতে এরশাদ সরকারও এ নীতিকে অনুসরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় কারণঃ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান

১৯৮০ সালের এ যুদ্ধে দুই বৃহৎ শক্তি (আমেরিকা ও রাশিয়া) নিজেদেরকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করে। ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী ইরানের পররাষ্ট্রনীতি মার্কিন বিরোধী হওয়ায় নিরপেক্ষতার খোলসে ইরানকে শায়েস্তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার সচেষ্ট ছিল। ১৯৮৩ সালের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে অস্ত্র সাহায্য প্রদান করে।[৪৮] সর্বোপরি ১৯৮৪ সালে ইরাক-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনপ্রতিষ্ঠিত হলে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সাথে গোপনে আলোচনার মাধ্যমে ১০০ মিলিয়ন ডলার মুল্যের এফ-৪, এফ-৫ বিমান সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্র চুক্তি করে। যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে সরাসরি সহযোগিতা করলে রাশিয়া পক্ষান্তরে ইরানকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে।

তৃতীয় কারণঃ মুসলিম বিশ্বের অবস্থান

ইরান-ইরাক যুদ্ধকালীন সময়ে মুসলিম বিশ্ব ও আরব বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একমাত্র জর্ডান ও মরক্কো ইরাকের প্রতি সরাসরি সমর্থন ও সামরিক সাহায্য প্রদান করে। অন্যদিকে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মারিতানিয়া ও উত্তর ইয়েমেন ইরাককে প্রত্যক্ষ সমর্থন দেয়। সিরিয়া ইরাকের বিরোধিতা করে ইরান-নীতি গ্রহণ করে। মার্কিন বিরোধিতার কারণে লিবিয়া ইরানের প্রতি তার সমর্থন জানায়। তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ক্যাম্পডেভিড চুক্তি পরবর্তী মিশর যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক গভীর হওয়ায় ইরাক-মিশর সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে এবং মিশর ইরাকের প্রতি সমর্থন জানায় ও অস্ত্র বিক্রি করে। পি.এল.ও ইরানের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে।

১৯৮০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সূচনা হয় এবং তা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রথমে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যুদ্ধ বন্ধের জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যান। ও আই সি, ইসলামি শান্তি কমিশন, জাতিসংঘ ও জোট নিরপেক্ষ সংস্থার সদস্য হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ বহিরাষ্ট্রের যে কোন আগ্রাসনের বিপক্ষে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প কয়েকমাস পরই মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামি সম্মেলন শুরু হয়। পারস্য উপসাগরীয় দুই মুসলিম দেশের মধ্যকার দুই ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়েই উক্ত সম্মেলন শেষ হয়।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেদ্দায় ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসানের জন্য বাংলাদেশ সহ কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধন্তানুযায়ী ইসলামি শান্তি কমিটি নামে নয় রাষ্ট্র সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রগুলো হল-

চেয়ারম্যান : গিনির প্রেসিডেন্ট (সেকেতুরে) ।

সদস্য : গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট (দাউদ জাওয়ারা)।

সদস্য : বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট (জিয়াউর রহমান)।

সদস্য : তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী (বুলন্দ ওলুসু)।

সদস্য : পি এল ও নেতা (ইয়াসির আরাফাত)।

সদস্য : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (জিয়াউল হক)।

সদস্য : মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী (রিতা উদ্দিন)।

সদস্য : সেনেগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (মুস্তফা নিয়াজ)।

সদস্য : ও আই সি মহাসচিব (হাবিব শাত্তি)।[৪৯]

উক্ত নয় সদস্যের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের মত একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্তি ছিল গৌরবজনক অধ্যায়। এতে করে মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্ব এবং বিশ্ব রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সফল হন। এ কমিটির মূল দায়িত্ব হল, কমিটির সদস্যগণ জেদ্দায় পারস্পরিক মত বিনিময় করবেন এবং পরবর্তীতে আলোচনা করবেন। তারপর তেহরান ও বাগদাদ গিয়ে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন যেন ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ দ্রুত বন্ধ হয়।[৫০] এ কর্মসূচিকেই সামনে রেখে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮১ সালের ২ মার্চ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা বাগদাদ সফর করেন।

উক্ত সময়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট বনি সদর যুদ্ধ বন্ধের জন্য দুইটি শর্ত আরোপ করেন। শর্ত দুটি হল-

১. দুই দেশের মধ্যকার দক্ষিণ সীমান্তের বিরোধের ব্যাপারে ১৯৭৫ সালের আলজিয়ার্স চুক্তির বাইরে কোন নিষ্পত্তি ইরান মানবেনা।

২. যুদ্ধ বিরতি ও ইরাকের হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার এক সাথে হতে হবে।[৫১]

৮-১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে ভারতে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের ভাষণে ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়মিত ভাষণে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, তার দেশ যুদ্ধে দখলকৃত ইরানি ভূমি প্রত্যার্পণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু পরিবর্তে ইরানকে বিরোধপূর্ণ এলাকায় ইরাকের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। ইরাকি প্রতিনিধির বক্তৃতার সময় ইরানি প্রতিনিধি সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা তুলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধবন্ধ একান্ত প্রয়োজন, মনে রাখতে হবে দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধে কোন বিজয় সূচিত হয়না।[৫২]

বাংলাদেশ ও তুরস্ক ইরান-ইরাকের অব্যাহত ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এ যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইসলামি শান্তি কমিটির প্রচেষ্টায় বিপুল আশাবাদ ব্যক্ত করে। বাংলাদেশী পররররাষ্ট্রমন্ত্রী তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইলবতার তুকমেনের সম্মানে দেয়া এক ভোজ সভায় বলেন, এ যুদ্ধ কেবল ইরান ও ইরাকের জন্য বেদনাদায়ক নয় তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য দুঃখজনক এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। তিনি আরো বলেন, ইসলামি শান্তি কমিটির বাগদাদ ও তেহরানের প্রথম মিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ও অধ্যাবসায় প্রমাণ করেছে, দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের মধ্যে সমঝোতার যে কোন অবস্থায় কমিটি দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে থাকবে।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ মাসের শেষ দিকে ইসলামি শান্তি কমিটির পক্ষ হতে পুনরায় যুদ্ধ বিরতি কার্যকর ও উভয় দেশের সাথে সংলাপের জন্য বাগদাদ ও তেহরান সফর করা হয়। উক্ত সফরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সহ শান্তি মিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ইরানের সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা কাউন্সিল প্রধান বনি সদরের সাথে সাক্ষাত করেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী রাজায়ি ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২৮ মার্চ ১৯৮১ সালের উক্ত বৈঠকের পূর্বে ইমাম খোমেইনী'র মুখপাত্র আলী খামেনি এক টেলিফোন সাক্ষাতকালের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য তিনটি শর্তের কথা ঘোষণা করেন। শর্ত তিনটি হল-

১. আমাদের ভূখণ্ড হইতে আক্রমণকারী সৈন্যদের শর্তহীনভাবে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

২. আক্রমণকারীকে শাস্তির বিধান এবং ইরাক-ই যে আক্রমণকারী উহার স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে।

৩. শাত-ইল-আরব প্রণালির উপর অর্ধেক কর্তৃত্ব সংক্রান্ত পূর্বোক্ত চুক্তির স্বীকৃতি দিতে হইবে[৫৪]।

ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত *A Review of The Imposed War* গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করে বলা হয়েছে-

> Among the conditions declered by the Islamic Republic of Iran for the termination of war are: An investigation about the causes of the aggression (by a component international authority), identification of the aggressor, evalution and reparation of war damages as well as the punishment of the aggressor.[55]

২৯ মার্চ পুনরায় শান্তি মিশনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দেশে ফিরে জিয়াউর রহমান অচিরেই যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন- ইরান ও ইরাক উভয় রাষ্ট্রই ইসলামি শুভেচ্ছা মিশনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে।[৫৬] ও আই সি কর্তৃক গঠিত শান্তি কমিটি যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ে তিনবার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ সকল উদ্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ইরান-ইরাক

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধাবসানের পন্থা অনুসন্ধানের জন্য ও আই সি ১৯৮১ সালের মে মাসে তেহরানে যে সম্মেলনের ডাক দেয় তাতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও জোট নিরপেক্ষ সংস্থার বাইরেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে এ যুদ্ধের কুফল বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সে সাথে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতির বিষয়টিও তাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। তার অকালমৃত্যু না হলে হয়তো এ যুদ্ধ এতটা দীর্ঘায়িত হত না। কেননা ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জিয়াউর রহমানের একক মিশনের প্রচেষ্টা অপ্রত্যাশিত ভাবে ফলপ্রসু হয়। এ মিশনে ইরান ও ইরাকের রাষ্ট্র প্রধানগণ যুদ্ধাবসানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোগুলো সম্পর্কে প্রথমবারের মত ঐকমত্যে উপনীত হন। এবং এ সকল শর্ত বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধবিরতি কমিশন সহ অন্যান্য তিনটি কমিশনে কারা সদস্য হবেন, সে সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রপ্রধান সম্মত হন। কিন্তু জিয়াউর রহমানের মৃত্যু এবং বনি সদরের পদচ্যুত হওয়া ঐকমত্যকে আলোর মুখ দেখা থেকে বিরত রাখে। তবে সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, এ দুদেশের মধ্যে সংঘাত নিরসন করতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা সফল বললে অত্যুক্তি হবেনা। কেননা ২৪ অক্টোবর শান্তি মিশনের পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট দেয়া হয় তাতে যুদ্ধ বন্ধ করতে যে প্রচেষ্টা ছিল তাকে উন্নতির সূচকে চিহ্নিত করা হয়।[৫৭]

১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে সরিয়ে এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে এরশাদ সরকার মিশনের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতিকে অনুসরণ পূর্বক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইরান-ইরাক যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের যে পদক্ষেপ ছিল এরশাদ সরকার সেভাবে পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

Dhaka University Institutional Repository

১৫-২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৪ সালে মরক্কোর ক্যসাব্লাংকায় ইসলামি সম্মেলনের ৪র্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সর্বমোট ৪৫ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৪২ টি রাষ্ট্র যোগদান করে। বাকী তিনটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আফগানিস্তান ও মিশর বহিষ্কার হওয়ায় এবং ইরান রাষ্ট্রীয়ভাবে যোগদান করেনি। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণে বাংলাদেশের ১১ দফা পেশ করেন। ২১ জানুয়ারি সম্মেলন শেষে এরশাদ দেশে ফিরে বলেন-

> শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ ফিলিস্তিন সমস্যা, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আল কুদস আল শরীফ ও মিসরকে ও আই সি তে পুণরায় অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। ইরানের প্রশ্নে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়। শুধু বাংলাদেশ কেন, সকল মুসলিম দেশই ইরানের পক্ষে কথা বলিয়াছে। ও আই সি'র শান্তি মিশনের সদস্য দেশ হিসেবে ইরান-ইরাক যুদ্ধ অবসানে কিছু বলা আমাদের দায়িত্ব। আমরা না বলিলে কে বলিবে। এখানে সমালোচনার কি আছে। ইরান তো শত্রু দেশ নয়।[৫৮]

১৯৮৫ সালের মে মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত শান্তি কমিটির বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী যোগদান করেন। এবং ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ও আই সি'র শান্তি কমিটির বৈঠকে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যোগদান করেন। উক্ত সভায় শান্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এতে মানবিক দুঃখ কষ্ট লাঘবের কথা বলা হয় এবং রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির সম্ভাবনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে ইসলামি শান্তি কমিটির ৮ম বৈঠকে এরশাদ যোগদান করেন। উক্ত বৈঠকে ইরান ও ইরাকের সাথে সমঝোতার জন্য উচ্চ পর্যায়ের গ্রুপ গঠন কল্পে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদকে প্রধান, ও আই সির মহাসচিব শরীফ উদ্দিন পীরজাদা এবং দুটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সদস্য করার কথা এ গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবটি এরশাদ সমর্থন করেন। এছাড়াও যুদ্ধ বন্ধে ইরান ও ইরাকের সীমান্তে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ইসলামি শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির বৈঠক শেষে এরশাদ বলেন, ইসলামি শান্তি কমিটি ৮ম অধিবেশনে সংঘাত অবসানের প্রশ্নে ও আই সি ও ইসলামি শান্তি কমিটি সদস্যদের প্রস্তাবগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। আলোচনায় বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমিটি চেয়ারম্যান যুদ্ধে জড়িত পক্ষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহাদেরকে পারস্পরিক আলোচনার জন্য বৈঠকে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে চেষ্টা করবেন।[৫৯] ঐতিহাসিক এ তৎপরতার উল্লেখ করতে গিয়ে মোঃ ফায়েক উজ্জামান বলেন-

> ১৯৮৫ সালের মে মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত শান্তি কমিটির বৈঠকে সামরিক সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী যোগদান করেন। এরপর ১৯৮৫ সালের ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ওআইসির শান্তি কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে. হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ যোগদান করেন। এই সভায় শান্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এতে মানবিক দুঃখ কষ্ট লাঘবের কথা বলা হয়। এবং রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির সম্ভাবনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া জাতিসংঘের সদস্য হিসেব বাংলাদেশ জাতিসংঘের সব ধরণের প্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়েছে। ১৯৮৮ সালের ২০ আগস্ট যুদ্ধ বিরতির পর জাতিসংঘ বাহিনীতে নিজেদের সেনাবাহিনী অন্তর্ভূক্ত করে ইরান-ইরাকের প্রতি বাংলাদেশ তার বন্ধুত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।[৬০]

১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকী ইরান ও ইরাকের প্রতি আত্মস্বার্থের ওপরে উঠে যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানান। তিনি বলেন, শান্তির জন্য বাংলাদেশ সব কিছু করতে প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সব সময় এ ব্যাপারে সক্রিয় রয়েছে। যুদ্ধ করে মুল্যবান সম্পদ নষ্ট করার নিন্দা করে তিনি বলেন, যুদ্ধের প্রতিযোগিতা নয় ইরান ও ইরাকের উচিত শান্তি ও উন্নতির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিব ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।[৬১] ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সালে বাংলাদেশে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করায় এ সময় শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া একই সাথে থেকে এরশাদ হটানোর ডাক দেয়। যে কারণে বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে বেশ নাজুক অবস্থায় পতিত হয়। এরশাদ সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকার কারনে ইরান-ইরাক যুদ্ধের বিষয়ে তিনি কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

১৯৮৮ সালের ২০ আগস্ট যুদ্ধ বিরতির পর জাতিসংঘ বাহিনীতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইরান ও ইরাকের সাথে বাংলাদেশ তার বন্ধুত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা- (অনূদীত), *আলোর পথে (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা)*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৬।

২. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি,ঢাকা, ২০০৩,পৃ. ১১৭।

৩. নূর হোসেন মজিদি (অনূদিত), *ইরানের সমকালীন ইতিহাস*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৮৭।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮।

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর , ১৯৭৯ , পৃ. ১।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯।

৭. এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্ত্বা রাষ্ট্র*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৪৩।

৮. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮।

৯. নূর হোসেন মজিদি (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯১।

১০. এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪।

১১. John D. Stempel, *Inside The Iranian Revolution,* Indiana University press, Bloomington, USA, 1981, p. 223.

১২. Masih Muhajeri, *Islamic Revolution: Future Path of the Nations*, The External Liaison Section of the Central office of JIHAD-E-SAZANDEGI, Tehran, Iran, 1983, p. 84.

১৩. *প্রাগুক্ত।*

১৪. নূর হোসেন মজিদি (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

১৫. এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫।

১৬. নূর হোসেন মজিদি (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।

১৯. Suroosh Irfani, *Revolutionary Islam in Iran (Popular Liberation or Religious Dictatorship*), Zed Book Ltd, London, 1983, p. 193.

২০. *Ibid,*P. 195.

২১. *দৈনিক আজাদ*, ২২ জানুয়ারি, ১৯৮১, পৃ. ১।

২২. নূর হোসেন মজিদি (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯।

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪।

২৬. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, (অনূদীত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭।

২৯. শাত-ইল-আরব হলো মধ্য প্রাচ্যের একটি নদীপথ। কিছু কিছু স্থানে এতে ইরাক ইরানের সীমান্তে রেখা অবস্থিত। ইউফ্রেটস ও টাইগ্রিস নদী পারস্য উপসাগরে পতিত হওয়ার ৬০ মাইল পূর্বে মিলিত হয়েছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই হল শাত-ইল-আরব। (মুহাম্মদ ইনাম উল হক অনূদিত,*মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান*, ইয়াহিয়া আরমাযানি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৬।)

৩০. ৬৩৭ সালের জুনে আরবরা পারস্যের রাজধানী দখল করে। তখন থেকেই পারসিকরা আরবদের মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি। তারা সর্বদাই তাদের প্রাচীন জাতীয় গৌরবের ব্যাপারে সচেতন ছিলো। ফলে মুসলিম শাসন আমলেই আরব-পারসিক দ্বন্ধ প্রকট আকার ধারণ করে।

৩১. M.S. EL Azhary (Ed.), *The Iran Iraq war: an historical, Economic and Political Analysis*, Croom Helm Ltd., London, 1984, p. 9.

৩২. Parviz Daneshvar, *Revolution in Iran*, Macmillan Press Ltd., London, 1996, p. 129.

৩৩. Sepehr Zabin, *Iran Since The Revolution,* Croom & Helm, London & Canberra, 1982, p. 176.

৩৪. The Iraqi Regime upon the Islamic Republic of Iran, *A Review of The Imposed War,* Embassy of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, 1983, p. 97.

৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ১।

৩৬. The Iraqi Regime upon the Islamic Republic of Iran, *Ibid,* p. 3.

৩৭. আবুল হোসেন (অনূদীত), *ইসলামি বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১১৬।

৩৮. মোঃ ফায়েক উজ্জামান, *ইরান-ইরাক বিরোধ যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক যুদ্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৬-৬৭।

৩৯. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।

৪০. M.S. El Azhary(edited), *The Iran Iraq war, Croom Helm,* London & Canberra, 1984, p. 45.

৪১. *Ibid*, p. ৪৬.

৪২. Encyclopedia of U.S. Foreign Relations, Oxford University Press, Oxford, New York, Vol. 2, P. 419.

৪৩. সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি (সম্পাদিত), ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, মোঃ মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ নজীব উল্লাহ সাকী, (*ইরান ইরাক যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা*), সংখ্যা ৩১-৩২, ঢা. বি. ২০০৯, পৃ. ৫৪৩।

৪৫. *প্রাগুক্ত।*

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৪।

৪৭. কাজী জাহেদ ইকবাল, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি* (১৯৭১-২০০১), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৮।

৪৮. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা।

৫০. দৈনিক দেশ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১।

৫১. *প্রাগুক্ত*, ৬ মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা।

৫২. *প্রাগুক্ত*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা।

৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১০ মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা।

৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা।

৫৫. The Iraqi Regime upon the Islamic Republic of Iran, *Ibid*, p. 45.

৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা।

৫৭. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫২-৫৫৩।

৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা।

৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা।

৬০. মোঃ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৬১. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক

১. বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

২. বাংলাদেশ ইরানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

৩. বাংলাদেশ ও ইরানের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্ক

৪. বাংলাদেশ ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক

৫. বাংলাদেশ ও ইরানের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

৬. শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক

৭. ১৯৭১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও যোগাযোগ

৮. বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্কের গতি প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক

প্রাচীনকাল থেকেই ইরান এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। বঙ্গীয় অঞ্চলে মুসলিম শাসনের শুরু হতেই আরব ও পারস্য ধর্মপ্রচারক, সূফি, পিরমাশায়েখগণের আগমনের ফলে পারস্য তথা ইরানের ধর্মীয় ভাবধারা, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই নিজ নিজ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যা আজকের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ও সে স্বার্থকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

১. বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ও ইরানের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। শাহনামার ভাষ্য অনুযায়ী ইস্কান্দার (আলেকজান্ডার) এর সময় কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ শতাব্দি হতেই ভারতীয় অঞ্চলে পারসিকদের যাতায়াত পরিলক্ষিত হয়।[১] পরবর্তীতে হাখামানশি (Achaemenian), আশকানি (Ashkanid) এবং সাসানি (Sasanid) সম্রাটগণের সময় ভারত ও প্রাচীন ইরানের সাথে সম্পর্কের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কের শিকড় খুঁজতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলেন-

> Bengal Muslims are the joint product of Muslim immigrants and local converts. Immigrants came mainly from Turkey and the Turkistans including Mongolia and Arabia, they were of Mongoloid Origin (The Turks and Afghans) of the Arian origin (the Iranians) and Semetic origin (the Arab).[২]

ইরান ও বাংলাদেশ তথা ভারতীয় অঞ্চলের সম্পর্কের প্রাচীন ভিত্তি আলোচনা করতে গিয়ে মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন *ইরানের কবি* গ্রন্থে বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

> এ উপমহাদেশে আর্যরা প্রধান। ইরানীরাও আর্য গোষ্ঠি। আর্যরা দীর্ঘকাল ইরানে বাস করে। ফলে সংস্কৃতিগতভাবে দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এমনকি ধর্মের ব্যাপারে সমতুল্য লক্ষ করা আচার আহার বেশভূষাও প্রধানত, দেবদেবীর নামও লক্ষণীয়। ইসলাম পূর্ব সময়ে মূলত ব্যবসায়িক ও পারিপার্শ্বক অবস্থায় মানুষের বাসস্থান স্থানান্তরের ঘটনায় ইরান ও এ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩]

এরই ধারাবাহিকতায় ইসলাম আবির্ভাবের পর মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় থেকেই এ অঞ্চলে পারস্যবাসীর যাতায়াত বাড়তে থাকে। ইরানের ব্যবসায়ী বিশেষ করে ধর্ম প্রচারক ও সূফি সাধকদের পদচারণায় অত্র অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা ও আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। গজনভী রাজবংশ প্রথম ইরানী হিসেবে পবিত্র ইসলামকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। গজনভীদের সময় পাঞ্জাব প্রদেশ তাঁদের অধীনে ছিল এবং এ প্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর লাহোর ছিল তাঁদের প্রাদেশিক রাজধানী। এই বংশের শাসনামলে বেশ কিছু মনীষী ভারতে আগমন করেন। তন্মধ্যে খোরসানের প্রসিদ্ধ জ্ঞানী আলবিরুনীর নাম উল্লেখযোগ্য।[৪] পরবর্তীতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পর এ অঞ্চলে ফারসি ভাষার মাধ্যমে ইরানের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। এ বিষয়ে আযিয আলিযাদেহ বলেন-

> বাংলা অঞ্চলে হিন্দুদের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের সময়কালে মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ১২০৪ খ্রি./ ১০৬ হিজরি সালে বাংলা অঞ্চল মুসলমানদের দখলে এনে দিল্লির সাথে সম্পৃক্ত করেন। এসময়ে এতদাঞ্চলে ইরানের প্রভাব ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি সর্বপ্রথম রংপুরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে সেখানে ফারসি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রচলন শুরু করেন এবং খিলজি তুর্কি বংশোদ্ভুত হয়েও ইরানি সংস্কৃতির প্রসারে ব্যাপক ভুমিকা পালন করেন। বাংলার সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসির প্রচলনও করেন তিনি।[৫]

ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন ও প্রমাণে যেমন ভারতের গুজরাটের কামবাটের নিকটে প্রাপ্ত শিলালিপি সমূহে সে সময়কার এবং তা ঐ যুগে ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ

Dhaka University Institutional Repository

বহন করছে।[৬] ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ড. কাযেম কাহদূয়ী বলেন-

> বসরার তৎকালীন শাসক আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন কুরাঈশ বিন রাবিয়াহর পক্ষ থেকে সিন্ধুর সীমান্তবর্তী এলাকার জন্য দায়িত্বশীল হিসেবে প্রেরিত আব্দুল্লাহ বিন সাররার আবদীর মাধ্যমে হিজরী ৪৩ সালে (৬৬৩ খ্রি.) প্রথম বারের ন্যায় দ্বীন-ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। এরপর হিজরি ৪৪ সালে (৬৬৪খ্রি.) মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাহ সিন্ধু আক্রমণ করেন এবং হিজরি ৮৯ সালে (৭০৮ খ্রি.) মোহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী সহ সিন্ধুতে উপনীত হন। এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ বিশেষ তার দখলে আসে। তবে ফারসি ভাষার মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজটি স্বয়ং ইরানি মুসলমানদের দ্বারাই সমপন্ন হয়েছিল।[৭]

এছাড়া সূফি, পিরমাশায়েখগণ বাংলাদেশের জনগণের সাথে ইরানের সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের সূচনা পর্বে পিরমাশায়েখগণের পদচারণার স্বর্ণালী ইতিহাস রয়েছে। বাংলায় সূফিবাদের প্রভাব আলোচনায় ড. এম এ রহিম বলেন-

> মুসলমান শাসনামলে বাংলা ছিল সূফি অধ্যুষিত দেশ। এই সূফিরা প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরক্কির জন্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন । কি ইসলাম বিস্তারে, কি মুসলমান শাসন সম্প্রসারণ ও সংহতি বিধানে, কি শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধারণভাবে বাঙ্গালি অধিবাসীদের, বিশেষ করে মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি উৎকর্ষ বিধানে সূফিদের কৃতিত্ব ছিল-মুসলিম সেনাপতি বিজেতা ও শাসকবর্গ অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী ও কার্যকর।[৮]

এ সকল সূফি সাধকগণের প্রবর্তিত বিভিন্ন তরীকার অনুসারীগণের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের অনেকেই ছিলেন ইরানি ও ইরানি বংশোদ্ভূত। মুরিদ-মুর্শিদ ও গদ্দিনশিন খলিফার (বর্তমানে খিলাফাত প্রাপ্ত) মধ্যকার এ সম্পর্ক, পিরমুর্শিদগণের আনুগত্য এবং পীর মুর্শিদগণের প্রতি আধ্যাত্মিক বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইরানি ও বাংলাদেশীগণের মধ্যে এক আবিচ্ছেদ্দ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে প্রচলিত সূফি তরিকার মধ্যে যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

তরিকার অনুসারীদের কর্মতৎপরতা বেশি রয়েছে তাদের মধ্যে কাদেরিয়া, চিশতীয়া ও নকশাবন্দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কাদেরিয়া তরিকার প্রধান শায়খুল ইসলাম আবু মোহাম্মদ আবদুল কাদের আল হাসানি আল হোসাইনি আল জিলানী (রহ.) ছিলেন ইরানের গিলান প্রদেশের অধিবাসী। আরবীতে গীলানকে জিলান উচ্চারণ করা হয়। চিশতিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) ও ইরানের খোরাসানের চিশত নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রধান শেখ শিহাব উদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দি (রহ.)ও ইরানি ছিলেন।[৯]

মুসলমানগণ কর্তৃক ভারতে সফল অভিযান পরিচালনার পর অতি অল্প সময়ের ভিতর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলই মুসলিম শাসকগণের আওতায় আসে। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদ লাহোর অধিকার করেন। পরবর্তীতে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীর, মুলতান, পেশোয়ার, থানেশ্বর, মথুরা, কানৌজ এবং সোমনাথ সহ পুরো ভারতেই রাজত্ব কায়েম করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাব ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সর্বপ্রথম ফারসি ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তাঁর বিজয় অভিযানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যে সকল মুসলিম শাসক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ফারসি ভাষী, জ্ঞান ও সাহিত্যানুরাগী। কবি সাহিত্যিকগণের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে তাঁদের দরবার সমূহ অলংকৃত করেছিলেন অনেক বড় মাপের কবি সাহিত্যিকগণ। রচনা করে ছিলেন মূল্যবান অসংখ্য গ্রন্থ।

এ যুগের ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে আবুল ফারাজ রুনি এবং মাসুদ সাদ সালমানের নাম উল্লেখযোগ্য। গজনীদের পর ঘুরি রাজবংশের হাতে উপমহাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। শিহাব উদ্দিন ঘুরির মৃত্যুর পর মামলূক বংশের সুলতানগণ ক্ষমতাসীন হন। ভারতে মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুব উদ্দিন আইবেক। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পর রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ৫ বছর রাজত্ব করে তিনি সুলতান ইলতুতমিশের নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইলতুতমিশ ১২১১-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এ সময় তাজুলমা'আসের এর লেখক সদরুদ্দিন মোহাম্মদ বিন হাসান নিযামী নিশাপুরী, *কিতাবুল লুবাবুল আলবাব* গ্রন্থের রচয়িতা মোহাম্মদ আওফি এবং *তাবাকাতে নাসিরি* গ্রন্থের লেখক মিনহাজ সিরাজের ন্যায় খ্যতনামা লেখকদের। ইলতুতমিশের পর ৬৩৩-৬৭৬ হিজরি পর্যন্ত যথাক্রমে সুলতান রুকনুদ্দিন, সুলতানা রাযিয়া, সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ ও সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবান দিল্লির শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং জ্ঞানী গুণী ও কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন। এমনকি সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র শাহযাদা মুহাম্মদ ইরানি কবি শেখ সাদিকে দুই বার ভারতে আসার জন্য দাওয়াত করেন। অবশ্য শেখ সাদি বিনয়ের সাথে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, যেহেতু কবি আমির খসরু দেহলভি তাদের দরবারে রয়েছেন সেহেতু তিনিই যথেষ্ট।[১০] তৈমুরি (মোগল) রাজবংশের ভারত আগমন ও শাসন ক্ষমতা পরিচালনার সময়েও ফারসি ভাষা কমবেশি প্রচলিত ছিল এছাড়াও খিলজি বংশ (১২৯০-১৩২০খ্রি.) তুঘলক বংশ (১৩২০-১৩৮৮খ্রি.) সৈয়দ বংশ (১৩৭৯-১৪৫১খ্রি.) এবং লোদি বংশ (১৪৫১-১৪৮৯খ্রি.) শাসনামলে আমির খসরু দেহলবি, শামসুদ্দিন আন্দাকানি, জিয়াউদ্দিন বারানি, মোহাদ্দেস আব্দুল কুদ্দুস আরদেবেলি, কবিকুল শিরোমণি (মালেকুশ শোআরা) বদর চাচী, মাওলানা জয়নুদ্দিন শিরাযি, প্রমুখ কবি সাহিত্যিক, লেখক ও জ্ঞানী-গুণীকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। স্বয়ং সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক (১৩২৫-১৩৩৫ খ্রি.) নিজেই কবি ছিলেন । তিনি ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন।

ভারত বর্ষের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর স্বয়ং বিদূষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তার দরবারে বহু আলেম ও জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবরের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে শুরু করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানী গুণীদের পৃষ্টপোষকতা করেন। এ শাহী বংশের ক্ষমতাচ্যুতি পর্যন্ত যে সকল মোগল সম্রাট শাসন কার্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করেন, বিশেষত বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব, এবং সিরাজুদ্দিন আবু জাফর বাহাদুর শাহ সহ তাদের অধিকাংশই জ্ঞানী-গুণী, লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের নিজ নিজ দরবারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। পাশাপাশি তাঁরা নিজেরাও ফারসিতে কাব্য রচনা করেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ফারসি ভাষায় *তুযাকে জাহাঙ্গিরি* রচনা করেন। তাঁর দরবারের কবিগণের অন্যতম ছিলেন উরফি সিরাজি এবং আবু তালেব আমুলি। খ্যাতনামা মনীষী কুদ্দুস মাশহাদি এবং কলিম কাশানি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের দরবারের জ্ঞানী-গুণীদের অন্যতম। এ সময়েই *ফারহাঙ্গেয়ে রাশিদি* ও *মুনতাখাবুল-লোগাতে শাহজাহানি* নামক অভিধান এবং *শাহেদে ছাদেক* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিখ্যাত গ্রন্থ *উপনিবন*, *ভগবতগীতা* ও *যোগশাস্ত্র* তাঁদের উৎসাহেই ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। নেয়ামত আলী খান, আকেল খান রাযি, মোল্লা মোহাম্মদ সাঈদ আশরাফ এবং গালেব দেহলবি বাদশাহ আলমগীর, আওরঙ্গজেব এবং বাহাদুর খান জাফরের দরবারের অন্যতম কবি ছিলেন। বাঙ্গালি মুসলমান পণ্ডিত ও কবিগণ ইসলামি শিক্ষা, আরবি ও ফারসি সাহিত্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলাদেশ ও ইরানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মহামিলন ও আনন্দের দিন হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। বাংলাদেশের মুসলমানদের ন্যায় ইরানেও এ দুইটি উৎসবকে অত্যন্ত জাঁকজমক ভাবে পালন করা হয়। রমজান মাসে সিয়াম সাধনা ও মুসলিম সংস্কৃতির এই মিলন বাংলাদেশ ও ইরানকে একই সংস্কৃতির মোহনায় মিলিত করেছে।

ইরানের মত প্রতি বছর মহররম মাসে কারবালা প্রান্তরের ইতিহাসকে সামনে রেখে আশুরার শোক পালন করা হয়। প্রায় ১০ দিন ব্যাপি বিভিন্ন সভা সেমিনার ও বিশেষ র‍্যালির মাধ্যমে আশুরার শিক্ষা ও তার তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। এ সকল অনুষ্ঠান ও তাজিয়া মিছিলে বিভিন্ন প্রকার পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে কালেমা খচিত বড় বড় পতাকা বহন করাতে মিছিল দৃষ্টিনন্দন রূপ লাভ করে। এছাড়াও ঐতিহাসিক এ ঘটনাবহুল দিনটিকে শোক পালনের আলোচনায় ড. জিনাত আরা সিরাজী বলেন-

> মুহররমের চাঁদ উদয় হবার পর থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত সব ইমাম পাড়ায় আলোচনা অনুষ্ঠান হয় যাতে নারী-পুরুষ সবাই উপস্থিত থাকে। সেখানে কারবালায় ইমাম হুসাইন ও তার পরিবার শহীদ হবার ঘটনা অত্যন্ত দরদের সাথে আলোচনা করা হয়। মর্সিয়া ও নওহা পাঠ করা হয়। এ সময়ে নামাজ, রোজা ও বিশেষ আমল করা হয়। মান্নত করা হয়। শরবত, ঠাণ্ডা পানি এবং বিভিন্ন ধরণের তাবারক উপস্থিত জনতা ও গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়। শিয়া মুসলমানরা সাধারণত মুহাররম মাসে শোকের প্রতীক হিসেবে কালো পোশাক পরিধান করে থাকেন।
>
> ১০ মুহাররম হুসাইনী দালান থেকে শোক মিছিল বের করা হয়। এ মিছিলে পূর্ব যুগের যুদ্ধের নমুনা প্রদর্শন করা হয়।[১২]

নওরোযের উৎসব ইরানি জনগণের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নওরোয উৎসব প্রচলনের সঠিক সন-তারিখ জানা যায়না। তবে এর নিদর্শনগুলো কয়েক হাজার বছর পূর্বেকার ইরানের হাখামানশি রাজবংশের শাসনামলের (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-৩৩০ অব্দ) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[১৩] উক্ত সময়ের পর থেকেই ইরানিদের মাঝে ঈদে নওরোজ পালন করার

Dhaka University Institutional Repository

রেওয়াজ পরিলক্ষিত হয়। প্রতি সৌর বর্ষের ফারভারদিন মাসের প্রথম দিন মোতাবেক খ্রিস্টিয় সালের ২১ মার্চ তারা ঈদে নওরোজ পালন করে থাকেন। বাংলাদেশের শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝেও ইরানিদের এ উৎসব উদযাপন করতে দেখা যায়।[১৪] এ উৎসব উদযাপন কালে 'হাফত সিন' নামক সাতটি দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে বর্ষকে বরণ করে নেয়া হয়। অন্য দিকে প্রতি বাংলা বছরের পহেলা বৈশাখ মোতাবেক খ্রিস্টিয় সালের ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশের পান্তা ইলিশ ও মিষ্টি দ্রব্যাদি দিয়ে নববর্ষের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। ২৩ দিনের ব্যবধানে উভয় দেশের নববর্ষ উদযাপন হলেও প্রকৃত অর্থে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান দুই দেশের সংস্কৃতিকে একই বৃত্তে দাঁড় করিয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বত্রই মসজিদ, মাদ্রাসা ও পিরমুরশিদদের খানকার দেয়ালে পাথরে খোদাই করা ফারসি শিলালিপি দুদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নিদর্শন বহন করে। যা এক ও অভিন্ন বিষয় হিসেবে দুই অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত শিলালিপির প্রাচীনত্বের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ড. কাজেম কাহদুয়ি বলেন-

> আরবি ও ফারসি ভাষায় এ ধরনের শিলালিপিসমূহের মধ্যে যে লিপিটি সুনির্দিষ্টভাবে ও প্রামাণ্যরূপে প্রাচীনতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তা হল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শীতলমঠ গ্রামের মসজিদের দরজার উপরে লিখিত শিলালিপি এর এক অংশে আরবি ভাষায় লেখা রয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কুরআন প্রেমিক মুত্তাকিদের জন্য এ পবিত্র ইমারত নির্মাণের কাজে অবশ্যই নসহিত। এরপর ফারসিতে নকশা খোদাই করে দরজায় লাগানো হয়েছে - আল্লার লানত তার ওপরে বর্ষিত হোক যে একায়দাকে পরিবর্তিত করবে এবং এতে ত্রুটি সৃষ্টি করবে।[১৫]

বর্তমানে এ সকল শিলালিপি উদ্ধার ও তার অর্থ উদঘাটনের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাজ করছে।

ইরানের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রন্থ অলংকরণ মিনিয়েচার (বহু দৃশ্য সংবলিত হাতে আঁকা চিত্র), এসলিমি (বক্র রেখা, সরু ও মোটা করে ফুল-লতা-পাতায় পরিণত করে মালার মত রূপদান), তাযহীব (সোনালী রং এর কাজ) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের রৈখিক চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইরান হতে আমদানিকৃত এসকল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সরাসরি প্রভাব এ অঞ্চলের জীবন সমাজে লক্ষ্য করা যায়। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেতে গিয়ে অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন-

> মুসলিম স্থাপত্যের প্রধান প্রধান উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে তাদের উৎস নির্দেশের চেষ্টা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে , তাদের প্রায় প্রত্যেকটির উৎপত্তি হয়েছে প্রাক-ইসলামিক যুগে; কোনো কনোটির জড় খুজে পাওয়া যাবে সূদুর অতীতে, হয়তো বা খৃষ্টপূর্ব যুগে। খিলান, খিলন ছাত (vault), গম্বুজ, মিনার রিওয়াক (cloister), ইওয়ান, উপাসনালয়ের ভিতরে খিলান পথের (aisal, bay) বিন্যাস, প্রায় সবকিছুই প্রাক-ইসলামি স্থাপত্য থেকে গৃহিত। বিভিন্ন প্রাক-ইসলামি নির্মাণ পদ্ধতি ও উপাদান গৃহিত হলেও স্থপতি ও নির্মাতা কারিগরদের দীর্ঘদিনের অনুশীলন-পরিশীলন ও গ্রহণ বর্জনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের একটি নিজস্ব রূপ গড়ে উঠেছে।[১৬]

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ অলংকরণের ক্ষেত্রেও মুসলিম চিত্রশিল্পিরাই ছিলেন পথিকৃৎ। এধরনের চিত্রাঙ্কনের রীতি ও কায়দা-কানুন পুরোপুরি ইরানি তাযহিব ও মিনিয়েচার রীতি থেকে গৃহীত হয়। ভারতীয় স্থপতিগণ ধনুকাকারের (বাঁকা) খিলান নির্মাণের কৌশল ইরানিদের থেকে আয়ত্ত করেছেন। এতে করে হিন্দু স্থপতিগণও মুসলিম স্থপতিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। এর ফলেই ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হয়। বাংলাদেশেও এ ধরণের স্থাপত্য রীতি, বিশেষ করে মসজিদ ও বাসস্থান নির্মাণে পরিলক্ষিত হয়। এ সকল স্থাপত্য শৈলীর প্রভাবের কারণে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইরান ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করেছে।

বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশ ও ইরানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সকল জাতীয় উৎসব ও সংস্কৃতি উৎসবে ইরানিদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরানের জাতীয় দিবস পালন ও সাংস্কৃতিক উৎসব সমূহ বেশ জাঁকজমকভাবে পালনে ঢাকাস্থ ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বেশ তৎপর। বাংলাদেশে রচিত ইরানের সাহিত্য কেন্দ্রিক গবেষণা গ্রন্থগুলোও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

অপরিসীম। অন্যদিকে বাংলাদেশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কিছু কবিতা ফারসি অনুবাদ করে *গুজিদেয়ে আহওয়াল ওয়া আশআরে কাজী নজরুল ইসলাম* শিরোনামে প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ হতে অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী গুণীদের ইরানের বিশেষ অনুষ্ঠান ও সভা সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে ইরান থেকেও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশে সফরে নিয়মিত যাতায়াত করছেন। এ সকল সফরের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ ও ইরানের সকল পর্যায়ের সম্পর্ক প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি হাফিজের প্রতিকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃত মন্ত্রণালয় ৩ জুন, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইরান বাংলাদেশ মৈত্রী স্মারক-২০০৪' নামে একটি ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করেছে। ইরান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ষষ্ঠতলায় 'হাফিজ প্রাঙ্গন' স্থাপন করা ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি বিভাগ উন্নয়নে গ্রন্থ ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা করে যাচ্ছেন।

ইরানি চলচ্চিত্র শিল্পের সার্থক পুনরুজ্জীবনের তিন বছর মেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করে। গত বছর ইরান বিশ্বের নানা দেশের ন্যায় বাংলাদেশে সাতদিন ব্যাপি এক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। এছাড়াও ঢাকায় পাঁচদিন ব্যাপি এক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাছাড়া সম্প্রতি ঢাকায় আয়োজিত স্বল্প-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবেও ইরানের দুটি চলচ্চিত্র অংশ নিয়েছে।[১৭]

শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে 'ইরান গ্যালারি' নামক কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে। এ গ্যালারটি ইরানের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির পরিচিতি মূলক নিদর্শন দিয়ে সাজানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলাদেশ ও ইরানের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্ক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ইরানে। ইরানের একটি অংশের নাম ছিল ফার্স বা পারস্য। আর এ ফার্স থেকেই ফারসি ভাষার নামকরণ। বর্তমান বিশ্বে ফারসি ভাষা আরবি ভাষার পর মুসলমানদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ইরারেন রাষ্ট্রভাষা ফারসি। এছাড়াও আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, ইরাক, পাকিস্তানসহ আরো অনেক রাষ্ট্রে ফারসি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত। কেবল প্রাচীনত্বের দিক থেকেই নয়, বরং ফারসি পৃথিবীর সমৃদ্ধ সাহিত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইরানের সাথে বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত একটি প্রাচীন সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৭৫ সালে স্বাধীন বাংলাদেশকে ইরানের রাজা মোহাম্মদ রেজা শাহের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিশীলতার নব দিগন্তের সূচনা হয়। ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে এর সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। আর রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সূদীর্ঘ ৬৩৩ বছর ফারসি বাংলাদেশ তথা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজভাষার আসন অলংকৃত করেছিল। সঙ্গত কারণেই শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যাঙ্গনেও এ ভাষা ও সাহিত্য গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[১৮] উভয় দেশের মাঝে শুরু হয় পুনরায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনিময়। এ দুদেশের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক সম্পর্কের উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন বলেন-

> ইরানের সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মের ছাপ পড়েছে। বোধহয় ভারতীয় প্রভাবও পড়েছে। Dr. Ignaz Goldzihar তাঁহার রচিত *Muhamad and Islam* গ্রন্থে ইরানি সূফি মতবাদের উপর ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মহাকবি ইকবালের ভাষ্যমতে পারস্য দর্শনে সূফিদের ছয় লতিফা ভারতীয় ষটচক্র ধারণা হতে গ্রহণ করা হয়েছে।
>
> ইরানি কবিরা ভারতে এসে বসবাস করার ফলে নতুন পরিবেশে নতুন নতুন উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি এমনকি হিন্দি শব্দ সংমিশ্রণ করেন তাদের রচনায়। পারস্য ভাষার কবি আমির খসরু এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি পারস্যবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসাই তাদের ভাষাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইয়াহিয়া আরমাজানি বলেন-

> আরব উপদ্বীপে উত্তরের ভূখণ্ড দুটি বৃহৎ গর্বিত শক্তির পদানত ছিল। পশ্চিমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং পূর্বে ছিল সাসানীয়গণ কর্তৃক শাসিত পারস্যবাসীগণ। তাদের ভাষাকে বলা হত পাহলবী বা মধ্যযুগীয় ফার্সী। তবে ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে পারস্যবাসীগণের মধ্যে অধিক একাত্মতা ছিল বলে নিজেদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে তারা গর্বিত ছিল।[২০]

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতির ব্যাপক বিস্তারের ফলে জীবনাচারে বিভেদ দেখা দিল বটে, কিন্তু আর সব আনুষঙ্গিক প্রকার-প্রকৃতিতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ইংরেজ আমলেও সামাজিক কাঠামোটি মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল এবং জীবন ও জীবিকা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি।[২১] তবুও উভয় দেশের মুসলিম অধ্যুষিত জনসাধারণের পারস্পরিক অনুসরণ, অনুকরণ ও চর্চার ফলে ইসলামি সংস্কৃতি কেন্দ্রিক প্রভাব ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে।

আফগান ও ইরানের মুসলিম শাসকগণ তাদের সুশাসন ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য এ অঞ্চলের জনগণের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে আসন পেতে বসেন। ফারসি ভাষা তাদের মাতৃভাষা হওয়ার কারণে তাদের সম্মানের পাশাপাশি তাদের ভাষাকেও সম্মানিত করতে থাকে। পরবর্তীতে ফারসি ভাষা দুই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা এ অঞ্চলের সাহিত্য ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধি এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন-

> মুসলিম শাসনের গোড়া থেকেই ফার্সী এ দেশের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল। এ ভাষা ও সাহিত্য আমাদের মাতৃভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে রস সিঞ্চন করেছিল শত শত বছর ধরে। আমাদের অনেক ফার্সী কবি-সাহিত্যিক এ সাহিত্যে ব্যক্ত করেছেন তাঁদের চিন্তাধারা ও ভাবাবেগ। এতে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা। এতে আমানত রয়েছে আমাদের অনেক জাতীয় ইতিহাস।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকদের পাশাপাশি ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। যার ধারা বর্তমানেও বহমান। বাংলায় ফারসি ভাষার আগমন ও বিস্তার এর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে আবদুল করিম বলেন-

> প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের ভাষা ছিল আরবী, কিন্তু আরবের বাহিরের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরা অধিকৃত এলাকার ভাষা সমূহের সঙ্গেও পরিচিত হয়। বিশেষ করিয়া পারস্য দেশ বিজয়ের পরে মুসলামনদের মধ্যে ফারসি ভাষা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতবর্ষে আসিয়া মুসলমানেরা ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা লাভ করে এবং বাংলাদেশে আসার পরে তাহারা বাংলাভাষাও আয়ত্ত করে। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে মুসলমানেদের মধ্যে অন্য দেশের ভাষা বা বিভিন্ন দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে কোন হীনমন্যতা ছিলনা। তবে মধ্য যুগে ধর্মের ভাষা রূপে আরবী এবং ঐতিহ্যের ভাষারূপে ফারসীকে মুসলমানেরা প্রাধান্য দিত।[২৩]

সুলতানি আমলের পর হতেই ফারসি ভাষার গভীরতা ও কথোপকথনের সহজতা জনসাধারণ ও শাসকদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করে। পরবর্তীতে পারস্য, আফগান ও তুর্কি সকল শাসকগণই ভারতে তাদের শাসনকালে ফারসি ভাষার মাধ্যমে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। ফারসি সরকারি ভাষা হওয়ার পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা বাংলা ভাষায় ও ফারসির ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এক পর্যায়ে ফারসি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শুরু হয় এ ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা। অনুবাদ, কাব্য অনুবাদ, গল্প অনুবাদ ও কাব্য-কবিতা এবং উপাখ্যান রচনায় ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুদের ফারসি চর্চার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন-

> মুসলমান আমলে ফারসী ছিল রাজভাষা। তাই মুসলমানের ন্যায় হিন্দু ও ফারসী পড়িতে লাগিয়া যায়। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গলে (রচনা ১৬০৮শতক-১৬৮৬খ্রী.) পাই-
>
> আবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে।
>
> বালকে পারসী পড়ে আখন হুজুরে ॥
>
> কানেতে সোনার কলম দোয়াত সম্মুখে।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবত নেপুণ কায়স্থগণ লেখে॥[২৪]

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের আদান প্রদান ও চর্চার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ড. কাজেম কাহদুয়ি বলেন-

> ফারসিভাষা বাংলার জনগণের চিন্তা-গবেষণা জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হওয়ার কারণে এ ভাষায় বিভিন্ন ধরনের বহু সংখ্যক কবিতা ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীনতম আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আলি বিন ওসমান হুজভীরির রচিত *কাশফুল মাহজুব* থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ, ঐতিহাসিক বর্ণনা, এবং চরিতসাহিত্য পর্যায়ের গ্রন্থবলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে মোগল যুগে রচিত গ্রন্থবলির কথা যেমন উল্লেখ করতে হয় তেমনি ইংরেজ আমলে লিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থবলির কথা উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থবলির লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন উবায়দুল্লাহ উবাইদি, আবদুল গফুর নাসসাখ, সাইয়েদ মাহমুদ আযাদ, আবদুর রউফ রহিম, নওয়াব আহসান উল্লাহ অন্যতম। এছাড়া হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ হতে ফারসিতে অনুবাদ ও উল্লেখযোগ্য। তেমনিভাবে সম্রাট জাহাঙ্গির এর সময়কালে হিন্দুদের মহাভারত, ঋগবেদ সহ অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের কথাও উল্লেখযোগ্য।[২৫]

ফারসি ভাষায় কথোপকথনের পাশাপাশি ব্যাপক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার কারণে বাংলা ভাষা দুর্বল হয়ে অনেকটা ফারসি নির্ভর হয়ে পড়ে। ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে 'কেবল ভাষা নয় মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যেও আমরা ফারসি প্রভাব লক্ষ্য করি। সেকালের সাহিত্য ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক। তাহাতে মানবীয়তার আমদানি করেন মুসলিম কবিগণ পারস্য সাহিত্যের অনুবাদ বা অনুসরণ দ্বারা। এই প্রসঙ্গে শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান এবং আলাওলের নাম চিরস্মরণীয় থাকবে।[২৬] তখনকার বাংলাভাষা ফারসির দখলে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন-

> (হোসেন শাহী আমল ১৪৯৪-১৫৩৮) স্থানীয় বাংলা ভাষা ছাড়া, ফার্সিও প্রচলিত ছিল। বিদেশী ভাষা হওয়া সত্বেও প্রাক-মোগল বাংলায় ফার্সি এতো প্রধান্য লাভ করেছিল যে, এটা পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় আগত চৈনিক পর্যটক মাহুয়ানের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করেছিল। পর্যালোচনাধীন সময়কালে এটা দরবারি ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল বলে মনে হয়। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায়ই বাংলা ছিল দিল্লি সাম্রাজ্যের অংশ, যেখানে ফার্সি ছিল দরবারি

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা। বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকারী ইলিয়াসশাহীরা নিশ্চয়ই সকল সরকারি কাজকর্মে ফার্সি বহাল রেখে ছিলেন। [২৭]

বস্তুত শাহী আমল ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচলন ও প্রসারের স্বর্ণযুগ। এ যুগের উপর আলোচনা করেতে গিয়ে ড. কাজেম কাহদুয়ি বলেন-

> ইলিয়াস শাহি যুগ হতে ফারসি ভাষা রাজদরবারের ভাষায় পরিণত হয়। তখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ফারসি ভাষা শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। তখন বেশিরভাগ উপাধি, পেশার নাম, সরকারি পরিভাষা এবং বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী ছিল ফারসি ভাষায়। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে, জামিন্দার(জমিদার), সেক্কাদার(শিকদার), মারাবদার, উকিলদার, সিপাহসালার ইত্যাদি। হোসেন শাহি আমলে বাংলায় ফারসি ভাষা খুবই গুরুত্বের অধিকারী হয়। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিশ্র রীতিতে (ফারসি-বাংলা) কবিতা রচনা করা হত। এসময় অনুবাদকগণ ফারসি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। এর মাঝে মাওলানা আবদুর রহমান জামির লেখা *'ইউসুফ জোলাইখা'* এছাড়াও *'লাইলি ও মজনু'* এসময়ই অনুদিত হয়। অনেকক্ষেত্রে ফারসি মর্সিয়ার ধরণেই বাংলায় মর্সিয়া রচনা করা শুরু হয়। এসকল মর্সিয়ার বেশিরভাগই কারবালার করুণ ইতিহাসের উপর লিখিত। বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব এমনই যে, এ ভাষায় অবিকৃতরূপে বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে প্রায় দশ হাজার ফারসি শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[২৮]

বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ইরানের কবি হাফিজ শিরাজীর সাথে পত্র যোগাযোগ করতেন। তিনি তাঁর রাজদরবারে পারস্য-কবিকে আমন্ত্রণ করেন।[২৯] খাজা জয়েন উদ্দীন হামদানী ও খাজা মোহাম্মদ কাজবিনী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত আসার প্রাক্কালে তারা হাফিজকে বলেন- আমরা আপনার ব্যয় বহন করতে সম্মত আছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে চলুন।[৩০] কথিত আছে কবি হাফিজ ভারতের উদ্দেশ্যে একবার ভ্রমণের জন রওয়ানা দিয়ে ছিলেন হরমুজ প্রণালী পাড়ি দেয়ার সময় সমুদ্রে ঝড় উঠলে তিনি যাত্রা বাতিল করেন। সে সময় ভারতে হাফিজের গজল ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার কবিতা ভারতে জনপ্রিয়তার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে মনসুর উদ্দিন বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের সমাদরে তাঁহার গজল গীতির প্রসিদ্ধিই মূলীভূত কারণ। হাফিজ কোনদিনই নামের জন্য লালায়িত ছিলেন না, কিন্তু বসরা গোলাপের মত তাহার গজলের খ্যাতি দিগদিগন্ত আমোদিত করিয়া ফেলিয়াছিল। হাফিজের গজল লোকের এত প্রিয় হইয়া গিয়াছিল যে ইহা দ্রাক্ষালতা পরিবেষ্টিত ইরানের সীমা ছাড়াইয়া শস্য শ্যামল বাঙালা দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার কবিতার জনপ্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই তিনি বলিতেছেন,

যে শেরে হাফিজে শিরাজ মি গুইয়ান্দ ও মি রাকসান্দ
সিয়াহ চশমানে কাশমিরী ও তোরকানে সমরকান্দি॥

(তাহারা হাফিজের গজলে গান করে ও নৃত্য করে,
কাশ্মীরের কালো-আঁখি সুন্দরী ও সমরখন্দের তুর্কী ও তরুণী।)[৩১]

সুলতান অসমাপ্ত একটি গজলের কয়েকটি ছত্র লিখে পাঠান। জবাবে কবি হাফিজ উক্ত গজলটি সম্পন্ন করে সুলতানের দরবারে পাঠিয়ে দেন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাটি ইরানের কবি গ্রন্থে এভাবে এসেছে-

কথিত আছে বাঙালার শাসনকর্তা গিয়াস উদ্দিন বিন সুলতান সিকান্দারের তিনজন দাসী ছিল। তারা সুলতানের অতি প্রিয়ভাজন ছিল। সারব, গুল ও লালা তাদের নাম ছিল। সুলতান একদিন এক মেসরা কবিতার চরণ বললেন- 'সাকী হাদীসে সারবো গোল ওয়া লালে মি রাওয়াদ'- কিন্তু দ্বিতীয় পদ পূরণ করিতে পারেননি। দরবারের সভাকবিগণও সুলতানের মনপুতঃভাবে পদ মিলাতে পারেননি। সুলতান এ মেসরা টুকু হাফিজের নিকট পাঠালেন এবং উক্ত মিসরার উপর গজল লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ইয়াকুত নামক একজন ভৃত্যের কাছে কিছু টাকা এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী হাফিজের নিকট পাঠালেন। কবি হাফিজ উক্ত মিসরার বাকী অংশটুকুর গজল লিখে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন,

সাকী হাদিসে সারবো গোলো লালা মি রওয়াদ
ওইন বাহাস বা সালাসায় গোসালে মি রওয়াদ॥
মায় খোর কে নও ওরূসে চেয়ান হদ্দে হোসেন ইয়াফত
কার ইন জামান যে ছোনায়াতে দেলাল মি রওয়াদ॥
শক্কর শেকান শোওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ
জিন কানদে ফারসি কেব বাঙালা মি রওয়াদ॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ হে সাকী সরব, গোলাব ও লালার কথা হচ্ছে, এই তিনজন রজকিনী সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে।

সুরা পান কর, কেননা বাগানের নতুন অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যের শেষ সীমায় পৌছেছে। এ সময় ঘটকের কাজ চলছে।

ভারতের সমস্ত তুতী পাখি পারস্য প্রেরিত এই ইক্ষু গ্রহণ করে মিষ্টি বিতরণ করবে।[৩২]

এভাবেই বাংলাদেশ ও ইরানের সাথে সাহিত্যের আদান প্রদান শুরু হয়। মুসলমানদের শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থা ফারসি হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে হাজার হাজার গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ ও রচনা করা হয়। ঐতিহাসিক এ সকল রচনার পাণ্ডুলিপিগুলো এখনো এদেশের লাইব্রেরিগুলোতে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানেও এ দুদেশের মাধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সে ধারা ক্ষীণ হলেও অব্যাহত আছে।

৪. বাংলাদেশ ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক

একটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অপর রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ সাধন এবং সম্পর্ক স্থাপন করাই হলো কূটনীতি। কূটনীতি শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Diploma' অর্থ্যাৎ ভাঁজ করা থেকে এসেছে। সভ্যতার বিবর্তনে Diploma বিবর্তিত হয়ে Diplomacy তে রূপ নিয়েছে। তেমনিভাবে সভ্যতার বিবর্তনের ফলে প্রাচীন পারস্য ও ভারত উপমহাদেশ হতে বর্তমানে ইরান ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান নীতির কারণে ইরান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। পরবর্তীতে ইরান ১৯ আগস্ট ১৯৭৫ সালে স্বীকৃতি প্রদান করে। ইরানের স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি নিয়ে 'ইরান ও কাতারের স্বীকৃতি' শিরোনামে তৎকালীন দৈনিক বাংলা পত্রিকা সংবাদে বলা হয়- তেহরান, ১৯ আগস্ট বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দান করেছে। আজ তেহরানে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।[৩৩] ইরান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পর দুদেশের মাঝে আন্তসম্পর্ক গড়ে উঠে। পরবর্তীতে দুদেশের

Dhaka University Institutional Repository

কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলে ইরান ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে মিশন প্রতিষ্ঠা পূর্বক রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ ও ইরানে দূতাবাস খুলে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে।

অন্যদিকে ইরানের ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হওয়া এবং শাহের দেশত্যাগের পর পরই ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে রানের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাজারগানের প্রতি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত এই বার্তার সংবাদ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় বাসস এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়, প্রেসিডেন্ট তাঁহার বাণীতে ইরানের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ হইতে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।[৩৪] এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়। বর্তমানে ইরানের সাথে বিশ্বের ৯৯ টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।[৩৫]

৫. বাংলাদেশ ও ইরানের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

এ দেশের সাথে ইরানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন। প্রাচীনকালে ভারতীয় অঞ্চলে ধন সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে পারস্য সম্রাট আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট এর লোলুপদৃষ্টি এ অঞ্চলের উপর পড়ে। তিনি 'ফুর' নামক ভারতীয় হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।[৩৬] এ অভিযানের সময় হতেই অত্র অঞ্চলের ধন-সম্পদ ও রত্নভাণ্ডারের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে রাজা বাদশাহ ও ব্যবসায়ীদের আগমন ব্যাপকতা লাভ করে। ইরানের সাথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে তৎকালীন বঙ্গের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয়। এদেশের তাঁতের শাড়ী, মসলিন বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত হয়। ব্যাপক চাহিদার কারণে ইউরোপ ছাড়াও ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মালাক্কা ও সুমাত্রায় এ মসলিন কাপড় রপ্তানি হত।[৩৭] এছাড়াও বাংলার চিনি দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডা, কর্ণাটে, আরব, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় পাঠানো হত।[৩৮]

ইরানের কার্পেট শিল্প ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প। এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল পাট। ইরান তার এ শিল্পের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণে পাট আমদানি করত এবং এখনো করে। কয়েক দশক পূর্বেও বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশী পাট রপ্তানী কারক দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল।

ইসলামি বিপ্লব-উত্তর ইরানের বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সাধারণ নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে তা হচ্ছে প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন কমিয়ে ইসলামি বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি ও ঔষধ রফতানি দেশগুলোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন। তৃতীয় বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিতাড়িত পাহলভি শাসনামলের তুলনায় বর্তমানে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সেসময় লেনদেন ছিল ৮৫ ভাগ, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে পৌছেছে ২১% এ। ইসলামি দেশসমূহের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রাক-বিপ্লবকালে ১.৯% এর তুলনায় বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে সেসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৩% এ।[৩৯]

শীত প্রধান দেশ হওয়ার কারণে ইরানিরা প্রচুর পরিমানে চা পান করে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইরানে বাংলাদেশী চায়ের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। প্রতি বছর ইরান বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে চা আমদানি করে থাকে। এছাড়াও চামড়া, নারিকেল, আনারস এবং বর্তমানে ইরানের বাজারে বাংলাদেশী গার্মেন্টস সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

১৯৭১ -১৯৮১ সালে পর্যন্ত ইরান কর্তৃক বাংলাদেশেকে আর্থিক সাহয্যের একটি সারণি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. প্রকল্প সাহায্য: ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে জুন ১৯৮১ (মার্কিন ডলার মিলিয়নে)

আশ্বাস				প্রদান		
দেশ	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
ইরান	.....	১২৫০০	১২৫০০	.....	৭৫০০	৭৫০০

সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বহি:সম্পদ বিভাগ, ফ্লু অব এক্সটারনাল রিসোর্সেস ইনটু বাংলাদেশ (১৯৮১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

খ.প্রকল্পহীন সাহায্য : ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে জুন, ১৯৮১(মার্কিন ডলার মিলিয়নে)

আশ্বাস				প্রদান		
দেশ	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
ইরান	১০০০	.....	১০০০	১০০০	.....	১০০০

সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বহি:সম্পদ বিভাগ, ফ্লু অব এক্সটারনাল রিসোর্সেস ইনটু বাংলাদেশ (১৯৮১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত)।[৪০]

বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশও ইরান থেকে অনেক পণ্য সামগ্রী আমদানি করে থাকে। আমদানিকৃত এ সকল পণ্য সামগ্রীর মাঝে জ্বালানি পণ্য অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন এবং আলকাতরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অপরিশোধিত তৈল বাংলাদেশে আমদানি করে পরিশোধন করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খাদ্য দ্রব্যের মাঝে খেজুর, জিরা, জাফরান এবং বিভিন্ন জাতের বাদাম আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে নকশাকৃত হস্তশিল্প ও কার্পেট অন্যতম। বাড়ি ঘরের মোজাইক ও টাইলস করার কাজে সাদা সিমেন্টও ইরান থেকে আমদানি করা হয়।

১৯৯৫ সালে যে সকল পণ্য বাংলাদেশ থেকে ইরানের রফতানি করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, সার, কাগজ, ক্যাবল ও রেশম ইত্যাদি হল অন্যতম। উক্ত বছরে ইরান থেকে যে সকল পণ্য আমদানি করা হয়েছে সেগুলোর মাঝে অন্যতম হল সিমেন্ট, গন্ধক, ফল, জিরা, পেট্রোল, পেট্রোলিয়াম দ্রব্য, রাসায়নিক বস্তু, যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি। ইরান বাংলাদেশের প্রধান সিমেন্ট সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়।[৪১] ১৯৯৪ সালের ১৫-২৫শে ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বপ্রথম ইরানি একক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৪২]

বর্তমানে ইরানের অসংখ্য ব্যবসায়ীকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশ নিতে দেখা যায়। তারা এ মেলায় ইরানের হস্তশিল্প, কার্পেট, কাঁচের শোপিস, মহিলাদের বোরকা, মেলামাইন ও রূপার জুয়েলারী সামগ্রীর প্রদর্শনী করে থাকেন। এছাড়াও ইরানের

Dhaka University Institutional Repository

শুকনা খাবার যেমন খেজুর, মশলা, জিরা, কিশমিশ ও নানাবিদ দ্রব্যের সমাহার পরিলক্ষিত হয়।

ইরান বিভিন্ন সময়ে এদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ সহায়তা করে আসছে। বিশেষ করে আশুগঞ্জ সার কারখানা নির্মাণকালে তৎকালীন ইরান সরকার সাড়ে বার মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য করেছে।[৪৩]

৬. শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্ক

বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম একটি বাহন হল শিক্ষা। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রথম যুগ থেকেই ধর্ম শিক্ষার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ স্থাপন করা হলে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার বাহন হিসেবে ফারসি ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। মুলতঃ পারস্যের ইসলাম প্রচারক, সূফী সাধক ও মুসলিম শাসকদের ন্যায় পরায়ণতায় প্রভাবিত হয়ে এ অঞ্চলের মানুষ তাদের মাতৃভাষা ফারসিকে বরণ করে নেয়। ১২০১ মতান্তরে ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে মুসলিম শাসনের পাশাপাশি এতদাঞ্চলের মানুষ ফারসি ভাষা চর্চা শুরু করলেও ইরান-আফগান বংশোদ্ভূত মোগল শাসক আকবর সর্বপ্রথম ভারতের শাসনকার্যের ভাষা ফারসিকে রাজভাষা হিসেবে মনোনীত করেন। সে সময় হতে বাংলা অঞ্চলে সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসি প্রচলন শুরু হয়। অবশেষে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক বিশেষ ফরমান-বলে ভারতের অফিস-আদালতে ফারসি ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে দেন।[৪৪] এর মাধ্যমে এ অঞ্চলে ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইরেজিকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করা হয়। সুদীর্ঘ ছয়শত বছর ফারসি রাজ ভাষা থাকলেও ইরেজিকে সরকারি ভাষা ঘোষণা দেয়ার পর ফারসি ভাষার জৌলুশ ক্রমান্বয়ে কমে আসতে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে ফারসি ভাষা চর্চা অব্যাহত থাকে।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতেই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ চালু হয়।[৪৫] তখন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ ও বাণিজ্য অনুষদ মিলিয়ে যে আটটি বিভাগ চালু হয়েছিল ফারসি বিভাগ ছিল তার অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

একটি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর পরই বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হওয়ার মাধ্যমে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অধিকতর জোরদার হতে থাকে। ১৯৮৪ সালে ঢাকাস্থ ইরানি দূতাবাসের অধীনে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ইরানের সংস্কৃতি বিশেষ করে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা, প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার এ ধারায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং এদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত এ ভাষার হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্দ্যেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৫ সালে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনাব হাশেমি রফসানজানি 'বাংলাদেশ-ইরান ফারসি চর্চা কেন্দ্র' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ ও ইরানের এসকল তৎপরতা ফারসি ভাষা সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সাংস্কৃতিক উপলক্ষ্য ও সভা সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা ও দুদেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। এর ফলে দুদেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য ভাবে বিস্তার ঘটছে। সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, বই, হস্তশিল্প প্রভৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপলক্ষ্য ও অনুষ্ঠানাদি ইরান ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরো গতিশীল করছে। দীর্ঘকাল হলেও বাংলাদেশে পুনরায় ফারসি ভাষা চর্চা শুরুর আলোচনায় ড. মো আব্দুস সবুর খান বলেন-

> মূলত স্বাধীনতা-উত্তরকালেই, এবং আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ইরানের ইসলামি বিপ্লব বিজয়-উত্তরকালেই বাংলাদেশে ফারসি চর্চা পুনরুজ্জীবিত হয়। যদিও এর সূচনা হয়েছিল পাহলভি শাসনামলে (১৯২১-১৯৭৯ খ্রি.)'র শেষের দিকে। ইরানের দ্বিতীয় পাহলভি শাসক মোহাম্মদ রেজা শাহ ইরানের সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রচারণার যে উদ্যোগ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশ থেকে বেশ ক'জন ফারসি শিক্ষক ও গবেষক ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর গবেষণার জন্য ইরান সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। অপরদিকে ইরান সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ইরানের প্রখ্যাত ফারসি গবেষক ড. মুঈনের জামাতা ড. মোর্তাজা শাররাফ ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ফারসি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন।[৪৬]

এ প্রেক্ষাপটেই বর্তমানে বাংলাদেশ ও ইরানের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন রূপে সম্পর্ক শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ১৯৭৮ সাল হতে এ যাবত পর্যন্ত যে সকল ইরানি ভিজিটিং প্রফেসর নিয়েজিত ছিলেন তারা হলেন- ড. মোর্তাজা শাররফ (১৯৭৮ সাল), ড. কাজেম কাহদুয়ি (১৯৯৪-১৯৯৬ সাল), ড. ওয়ালি উল্লাহ জাফারি (১৯৯৬-১৯৯৭ সাল), ড. আহমেদ তামিমদারি (১৯৯৭-১৯৯৯ সাল), ড. সিরুশ শামিসা (১৯৯৯-২০০০ সাল), ড. মাহমুদ বাশিরি (২০০১-২০০৩ সাল), ড. হোসাইন ফাতেমী (২০০৪-২০০৬ সাল), ড. আলি মোহাম্মদ গিতি ফোরুজ (২০০৮-২০১০ সাল), ড. শাহরুখ মোহাম্মদ বেইগী (২০১০-২০১২ সাল) ও ড. নেয়ামতুল্লাহ ইরানযাদেহ (২০১২-২০১৩ সাল)। এবং বর্তমানে ড. দরুদগারিয়ান এ বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

ফারসি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইরান সরকার বাংলাদেশ থেকে ফারসি শিক্ষকদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ইরানে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি ফারসি ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইরান ও ফারসি ভাষা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদি কোর্সে ইরানে ট্রেনিং এর আয়োজন করছে। এতে করে দুই দেশের শিক্ষা বিনিময় সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ফারসি ভাষা শিক্ষা দান করা হয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ঃ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তদানিন্তন ইংরেজ প্রশাসন এ অঞ্চলে ফারসি চর্চার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই অন্যান্য বিষয়ের সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকেও পৃথক বিভাগের মর্যাদায় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করেন।[৪৭] এর মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফারসি ভাষা চর্চা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি সিলেবাসভূক্ত করে বিশেষ কোর্স হিসেবে পাঠদান করা হয়।

আলিয়া মাদ্রাসা পর্যায়ঃ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং দরসে নিযামিয়া বা বেসরকারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা অব্যাহত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের দাখিল হতে কামিল পর্যায়ের অধিকাংশ মাদ্রাসায় ফারসি সিলেবাসভূক্ত বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ক্বওমি মাদ্রাসা পর্যায়ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের ক্বওমি মাদ্রাসা বা বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোতে স্বল্প পরিসরে ফারসি ভাষা শেখানো হয়। কিন্তু এক সময় অসংখ্য ফারসি গ্রন্থ ও ফারসির মাধ্যমে আরবি ব্যাকরণ ও অন্যান্য বই সিলেবাসভূক্ত ছিল। এ সকল মাদ্রাসায় ফারসি গ্রন্থগুলোকে উর্দু অনুবাদের মাধ্যমে পড়ানো হয়। এছাড়াও কবিতা, নীতিগ্রন্থ, সূফি সাহিত্য ছাড়াও তাফসির, হাদিসের কিছু গ্রন্থ ফারসিতে পড়ানো হয়।

ভাষা শিক্ষা কোর্স পর্যায়ঃ ফারসি ভাষা শিক্ষার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে ইরান সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতায় এদেশে ফারসি ভাষা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বিশ্বদ্যিালয়গুলোর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্বদ্যিালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনিস্টিটিউট এ ফারসি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া ইরান কালচারাল সেন্টারে ও ফারসি ভাষা শেখার বিভিন্ন কোর্স চালু রয়েছে।

শিক্ষাখাতে ইরান ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ১১ অক্টোবর তদানিন্তন ইরানের প্রেসিডেন্ট আলি আকবর হাশেমী রফসানজানি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি উক্ত সময়ে 'বাংলাদেশ-ইরান ফারসি চর্চা কেন্দ্র' এর উদ্বোধন করে শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ ও ইরানের অবস্থানকে আরো মজবুত করেন।

৭. ১৯৭১ সাল পরবর্তী বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও যোগাযোগ

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে আঞ্চলিক ও ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান আমলেও অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডে ইরানের সাথে লেনদেন অব্যাহত ছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে ইরানের পাকিস্তান নীতির কারণে কিছুদিন সম্পর্ক ভাল যায়নি। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এ দুদেশের সাথে নতুন করে সম্পর্কের পথচলা শুরু হয় যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পরপরই দুদেশের মাঝে আন্তসম্পর্কের সূচনা হয় এবং উভয় দেশে কূটনৈতিক মিশন খোলা হয়। বিপ্লব পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মেহদী বাযারগানকে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা প্রদানের মাধ্যমে পূর্বের সম্পর্ক অব্যাহত রাখেন ।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম বিভাগের সচিব কাজী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তেহরান সফর করেন। উক্ত সফরের খবর বিবিসির বরাত দিয়ে *দৈনিক ইত্তেফাকে* বলা হয়, বাংলাদেশ ইরানের জাতীয় তৈল কোম্পানী (NIOC)'র নিকট হতে ৪ লক্ষ টন অপরিশোধিত তেল ক্রয় করবে। এ ব্যাপারে তেহরানের সাথে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়।[৪৮] একই বছরের ৩ মার্চ ইরানের সোনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আলী ওভায়মীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সেনাবাহিনীর একটি শিল্ড প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানের পর দুই দেশের সেনাবাহিনী পর্যায়ে সম্পর্কের সূচনা ঘটে। উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ইরানি সেনাবাহিনীর প্রধান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব।[৪৯] এর পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের প্রভাবশালী মন্ত্রী হিজাজি ৮

Dhaka University Institutional Repository

মে, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সফর করেন।[৫০] তার সফরে বাংলাদেশ এবং ইরানের সাথে দ্বিপাক্ষিক অনেক বিষয়ে সম্পর্ক জোরদারের ব্যাপারে আলোচনা হয়। ইরানি মন্ত্রী নারীউন্নয়নে ও জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে ইরানের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন।

২০ জুলাই, ১৯৭৬ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কাজী আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ দল মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। উক্ত সফরকালে এদলটির প্রধান ইরানের মন্ত্রী পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে সড়ক ও সমুদ্র যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দুই দেশের মধ্যে জনশক্তি ও কারিগরি সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ৩ টি কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ হতে ৩০ টি পণ্য রপ্তানির একটি তালিকা ইরানের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন। ইরানের বিনিয়োগে বাংলাদেশে একটি তেল শোধনাগার স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। সাংস্কৃতিক চুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে উভয় দেশের অংশগ্রহণ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তার এ সফরেই ইরান বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৫১] কাজী আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে স্বাক্ষর হওয়া উক্ত চুক্তির মাধ্যমে পণ্য রপ্তানীর পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানীর বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়।[৫২] এছাড়াও ইরানি মন্ত্রিগণ বাংলাদেশ হতে ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী, ট্রাক চালক ও গৃহপরিচারক সহ ইরানের জন প্রশাসন অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং খাতেও বাংলাদেশীদের নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।[৫৩]

১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ইরান যান। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সাত সদস্যের এ প্রতিনিধিদল মার্চ মাসের ৭ তারিখে ইরান পৌঁছেন।[৫৪] ঢাকা ত্যাগকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জিয়াউর রহমান বলেন-ইরানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দশ বছর, বিশ বছর কিংবা ত্রিশ বছরের নয়, এই সম্পর্ক শতাব্দি কালের। তিনি আরো বলেন- এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভ্রাতৃত্বমূলক।[৫৫] জিয়াউর রহমানের এ সফরে ইরান বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন মোড়ক

Dhaka University Institutional Repository

উন্মোচিত হয়। এ সফরেই ঐতিহাসিক ইরান-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও ইরান - বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক, কারিগরি সহযোগিতা চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন পরিকল্পনা দফতরের উপদেষ্টা ড. এম. এন হুদা এবং ইরানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ইরানের তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী ড. মানুচেহের তসলিমী। ইরান-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন বাণিজ্য উপদেষ্টা জনাব সাইফুর রহমান এবং ইরানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন ইরানের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব ফল ফউদ।[৫৬] ড. এম. এ. হুদা ও ইরানের পরিকল্পনামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ এর যৌথ নেতৃত্বে দুদেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হয়।[৫৭] ১০ মার্চ জিয়াউর রহমানের তেহরান ত্যাগের প্রাক্কালে তাকে রাজকীয় বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে ইরানের শাহ একটি বাণী প্রদান করেন। উক্ত বাণীতে ইরানের শাহ জিয়াউর রহমানের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ফলপ্রসু মতবিনিময়কে বাংলাদেশ ও ইরান দুই দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন আরো জোরদার করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৫৮]

জিয়াউর রহমানের ইরান সফরের কিছুদিন পর ইরানের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি দল রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসে। তারা জনশক্তি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রটোকল এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা সহ মোট তিনটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে এদেশের জনশক্তি বিশেষ করে প্রায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) ডাক্তার ইরানে কর্মরত ছিল।[৫৯]

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ স্বৈরশাসন থেকে বেরিয়ে এসে সংসদীয় গণতন্ত্রে যাত্রা শুরু করে। এর পরই শুরু হয় শাসন ব্যবস্থায় পুনরায় গণতন্ত্র চর্চা। এ সময় ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রফসানজানির উপদেষ্টা মাওলানা ইসহাক মাদানী ও হুজ্জাতুল ইসলাম আদাব এবং জনাব খোশ আমাদী বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরে তারা বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম ওলামাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্কের উপর আলাপ আলোচনা করেন।[৬০]

১৯৯৩ সালের ২৬ 'বাংলাদেশ-ইরান বিমান চলাচল সংক্রান্ত সহযোগিতা' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইরান এয়ার ও বাংলাদেশে বিমান দুদেশে আসা যাওয়ার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়।[৬১]

২৬ ও ২৭ অক্টোবর, ১৯৯৩ সালে ইরান-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বাণিজ্য ও শিল্পখাতে উভয় দেশ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, ইরানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ইরানের জেহাদে সাজেন্দেগী মন্ত্রী জনাব জি. আর. ফরউজেশ। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সাংস্কৃতিক চুক্তি নবায়ন করা হয়।[৬২]

২১ মে ১৯৯৫ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহিদা রফিক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিসেস দিলারা চৌধুরী যোগদান করেন।[৬৩]

৮ জুলাই ১৯৯৫ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সভাপতি ড. আলী লারিজানি ৩ দিনের সফরে বাাংলাদেশে আসেন। উক্ত সফরে 'ঢাকা-তেহরান তথ্য সহযোগিতা' চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির পক্ষে বাংলাদেশের তৎকালীন বাণিজ্য ও তথ্যমন্ত্রী এম. শামসুল ইসলাম ও ইরানের পক্ষে ড. আলী লারিজানি স্বাক্ষর করেন।[৬৪]

বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশ ইরানের সম্পর্কের নতুন দিগন্তের সূচনা হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রফসানজানির বাংলাদেশ সফরের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে। এ সফরের সময় অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক খাতে কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করা হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইরানের প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনে ইরানের সহযোগিতা কামনা করেন।[৬৫] এ ছাড়াও ভারতের সাথে পানি বণ্টন সমস্যা নিয়ে আলোচনার আশ্বাস প্রদান করেন।[৬৬] রফসানজানির এ সফরে বাংলাদেশের মাননীয় প্রেসিডেন্টের ভোজ সভা, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভোজসভা, গুলশানস্থ ইরানি রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে ওলামা সমাবেশ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সমাবেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ ও ২২ সদস্যের ইরানি প্রতিনিধি দলের শীর্ষ পর্যায়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ২টি চুক্তি ও ৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

- চট্টগ্রাম-তেহরান বাণিজ্য চুক্তি,
- বাংলাদেশ-ইরান-তুর্কমেনিস্তান এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সড়ক, রেল পরিবহন ও ট্রানজিটের ওপর ত্রিপক্ষিয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য ও তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকতবর বেলায়েতী এবং তুর্কমেনিস্তানের পররাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী ওরাজেভ মেরেত বালায়ামেভিচ।
- জ্বালানী, কৃষি, টেলিযোগাযোগ এর ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ব্যাপারে দুদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক,
- চট্টগ্রামে একটি তেল শোধানাগার স্থাপন সমঝোতা স্মারক,
- সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমঝোতা স্মারক,
- মাদক চোরাচালান বন্ধে সহযোগিতা,
- সন্ত্রাস দমন ,

Dhaka University Institutional Repository

- পরিবেশ সহযোগিতা,
- বাণিজ্য সম্প্রসারণে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।[৬৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভবন উদ্বোধনকালে ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রফসানজানি যে ভাষণ প্রদান করেন তার উল্লেখযোগ্য অংশটুকু হল-

> আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও সাহিত্যের পণ্ডিত ও মনীষীবর্গের খেদমতে কিছু সময় কাটাতে পেরছি। বাংলাদেশ সফরের এ অনুষ্ঠান আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। আমি আপনাদের সাথে যে কথা বলতে চাই, তাতে দুটি বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেব, একটি হলো, আজকের সমাজ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকার গুরুত্ব। অপরটি ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে।
>
> ইসলামি শিক্ষায় সমাজের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দুটি উপাদানের মৌলিক প্রভাবের কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। একটি হল, আমীর ও শাসকগণ, অপরটি আলেম ও জ্ঞানী-মনীষীগণ। বর্তমানে যেহেতু শাসক শ্রেণী জনমতের মধ্যস্থতায় শাসন ক্ষমতায় আসেন সেহেতু আসল ব্যপারটি আলেম ও জ্ঞানী-মনীষীদের দিকেই ফিরে যায়, যারা সমাজের জনমতকে সংগঠিত করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সত্যিকারভাবে সমাজের বর্তমান ও আগামী দিনের প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে সে প্রয়োজন পূরণের খাতে বিনিয়োগ করে তাহলে সমাজ কিছুতেই পিছিয়ে থাকবেনা।
>
> যদিও বাহ্যিকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে নৌ-বহর, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে সাধিত হয়েছে, কিন্তু এগুলোর মূল উৎস খোজ করতে হবে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে। আজ যেহেতু যোগাযোগ মাধ্যম শক্তিশালী হওয়ার ছত্রছায়ায় পৃথিবী ছোট হয়ে এসেছে বা অভিজ্ঞ মহলের মতে আজকের পৃথিবী ছোট গ্রামে পরিণত হয়েছে, সেহেতু আমাদের সামনে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে আমাদের সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে পারব।
>
> ১৮৩৫ সালে ইংরেজরা যে অশুভ আদেশটি জারি করেছিল তারপর থেকে নিয়ে ১৬০ বছর চলে যাওয়ার পরের ঘটনা। ইংরেজদের এ পদক্ষেপের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান প্রজন্মে তাদের পিতৃ-পুরুষের মূল্যবান রচনা সম্ভার ও গ্রন্থাগারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছে। আর এটি যেকোন জাতির জন্য এক বিরাট বিপদ। ঐ সময়ের কয়েক যুগ পরেও জ্ঞানী-মনীষীরা যখন কথা বলতে চাইতেন অতীতের ফারসি পরিভাষাকে বাদ দিয়ে তারা কথা বলতে পারতেন না। তারা ফারসি ভাষার বাক্য, শব্দ, পরিভাষা, বাগধার ও বর্ণনা শৈলীর সাহায্যে কথা বলতে বাধ্য ছিলেন।

আমি একজন মুসলমান হিসেবে, একজন ফারসিভাষী হিসেবে এবং এ অঞ্চলের সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগী একজন মাদ্রাসা ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের এই পদক্ষেপের জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর আমিও নিছক ফারসি-প্রীতি নয় বরং আন্তদেশীয় এবং একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক ও মহাদেশীয় উদ্যোগ হিসেবে আপনাদের এই শুভ কাজে শরিক হচ্ছি। আমি আশাকরি যে, আপনাদের সন্তানরা ভবিষ্যতে এর সুফল ভোগ করবে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এবং মাননীয় শিক্ষমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।[৬৮]

১৯৯৭ সালের ৯-১১ ডিসেম্বর তেহরানে অনুষ্ঠিত ও আই সি'র ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগদান করেন। ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ও আই সি শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এশিয়ার সদস্য দেশগুলোর পক্ষে ভাষণ দান করেন তার সার সংক্ষেপ হলো-

উগ্র ইয়াহুদিবাদ ঘৃণার শিকার হয়ে আছে ফিলিস্তিনি ও আরবরা, সার্বিয় হামলার হুমকির মধ্যে আছে বসনিয়ার মুসলমানরা, অসহিষ্ণু ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদে ক্ষত আফগানরা, আরমেনীয় আগ্রাসনের মুখে আজারিরা এবং সোমালিয়রা ডুবেছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর ব্যাধিতে। মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক রক্ষা ও জোরদার করার জন্য তার সর্বাত্মক অঙ্গিকার ব্যক্ত করতে হবে। আমাদের সর্বপর্যায়ের কর্মকাণ্ডে এবং মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা সংহত করতে হবে। তিনি উক্ত সম্মেলনে মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য ৭ দফার একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। আমরা আমাদের জনগণকে মর্যাদাপূর্ণ ও সুন্দর জীবনধারা যোগাতে সফল হওয়ার আশা রাখি। আগামী শতাব্দিতে ন্যায় সঙ্গত দাবী সফলভাবে আদায়ের জন্য জনগণকে একটি পরাক্রমশালী শক্তিতে সংঘবদ্ধ করতে আমরা সমর্থ হব। আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ তা কঠিন হবে নিশ্চয়ই,

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইসলামি উম্মাহর শক্তিও হবে পরাক্রম। আমরা ঐক্য শক্তি ও সাহস দিয়ে সব বাধা জয় করবো এবং ইসলামের আলোর মশাল এগিয়ে নিয়ে যাব। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেব ইসলামের আলো ও শুভেচ্ছা। ঠাণ্ডা লড়াই অবসানের পর সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় যুদ্ধাতঙ্ক, অসহিষ্ণুতা, অবিচার ও নিপীড়ন দেখা দিয়েছে। ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার ফলে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে।

শীর্ষ সম্মেলনে একমাত্র মহিলা সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামি বিশ্বের মুসলমান বোনদের পক্ষে সকল মুসলিম নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতীয় জীবনের মূল স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য একটি সমন্বিত ইসলামি কর্মপন্থা গ্রহণের আহবান জানান। জাতীয় কর্মকাণ্ডের সর্বস্তরের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের কোন বাস্তব ও যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়।[৬৯]

১৯৯৯ সালের ১-২ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডি-এইট (D-8) আন্তর্জাতিক সম্মেলেনে ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. হাসান হাবিবী যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ডি-৮ এর সভাপতি নির্বাচিত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খাররাজি এক রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ 'পার্সিয়ান স্টাডিজ ভবন'এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ১০ অক্টোবর ২০০৬ সালে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এক রাষ্ট্রীয় সফরে ইরান গমণ করেন। ২০১২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ন্যাম সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইরান বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক পূর্বের ধারায় অটুট আছে বলে প্রতীয়মান হয়। ১৬ তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ৩০ আগস্ট ভাষণ দান করেন। পরদিন *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত উক্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো-

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাবিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) কে অধিকতর শক্তিশালী কার্যকর ও ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সর্বোচ্চ সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আমাদের নেতৃবৃন্দকে ন্যামের সামগ্রিক অঙ্গিকারের মূলনীতি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ে নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সুষম সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার জন্য ন্যাম নেতৃবৃন্দকে পরিবর্তিত বিশ্বসংস্থা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংগে একযোগে কাজ করতে হবে। অবিচার বৈশ্বিক সংঘাতের মূলকারণ বিধায় ন্যামকে সর্বক্ষেত্রে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিতে হবে। কেবল ন্যায়বিচারই শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যেতে পারে। ষাটের দশকে ন্যামের কর্মকাণ্ড ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং উপনিবেশভূক্ত দেশগুলোর স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে আজ গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও জলবায়ু বিপর্যয়ের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তিত জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ন্যামকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আল কুদসকে রাজধানী করে একটি সার্বভৌম ও স্থিতিশীল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ন্যামের দাবির প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। তিনি ন্যামের প্রতি অভিন্ন ও পৃথক দায়-দায়িত্বের নীতির ভিত্তিতে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন এবং সবুজ প্রযুক্তি হস্তান্তরে জলবায়ু তহবিল গঠনের জন্য আরেকটি বৈশ্বিক চুক্তির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও অন্যত্র খরা, খাদ্য ঘাটতি ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির খবর খুবই উদ্বেগজনক। উন্নয়নের জন্য অভিবাসনকে এ শতাব্দির অন্যতম বৃহৎ আন্তঃরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ন্যামভূক্ত দেশগুলো বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিবাসী শ্রমিক যোগান দিয়ে থাকে। এদের পাঠানো রেমিটেন্স দারিদ্র বিমোচনে অবদান রয়েছে। তুলনামূলকভাবে অর্থের অবাধ প্রবাহ থাকলেও শ্রমের ক্ষেত্রে তা নেই। ন্যামকে গ্যাট এর 'মোড ফোর' বাস্তবায়নে সোচ্চার এবং বিশেষ করে নারী ও নিরাপদ অভিবাসন ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্যোগ গ্রহণের উপর জোর দেন।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ন্যামের অবস্থানকে আমরা সমর্থন করি এবং এ সমস্যার মূলোৎপাটনে সবধরণের সহায়তা প্রদানে অঙ্গিকারাবদ্ধ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের নির্মম

Dhaka University Institutional Repository

> হত্যাকাণ্ড ও ২০০৪ সালে তার প্রাণহানির অপচেষ্টার উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, সন্ত্রাসবাদের মত অপরাধমূলক কাজে রাষ্ট্রীয় শক্তির মদদ বন্ধ করতে হবে। ন্যায় এবং গণতান্ত্রিক ও আর্থসামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য অনুরুপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসরাইল ফিলিস্তিন জনগণের উপর জুলুম, হত্যা, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের মতো বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি মাসে রামাল্লায় ফিলিস্তিন সংক্রান্ত ৫ সদস্যের ন্যাম কমিটির মন্ত্রী পর্যায়ের নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠানে বাধা দেয়ার জন্য ইসরাইলের নিন্দা জানান। এ ধরনের পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন ।
>
> শেখ হাসিনা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ১৬৯তম শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থার সভাপতির দায়িত্বগ্রহণের জন্য ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।[৭০]

উল্লেখ্য যে, নতুন এ কমিটিতে বাংলাদেশ সহসভাপতি নির্বাচিত হয়।[৭১] ৩০ আগস্ট সম্মেলনের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদের সাথে একান্ত বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে দ্বি-পক্ষিয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তরা দ্বি-পক্ষিয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ৩১ আগস্ট ২০১২ সালে *The Daily Star* পত্রিকার খবরে বলা হয়, শেখ হসিনা দেশের অর্থনীতির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আহমেদিনেজাদকে বলেন-

> Bangladesh maintains its microeconoimics stability despite the global recession Bangladesh economy is doing well despite the global economic meltdown.[৭২]

সমাপনি অধিবেশনে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপের পক্ষে ধন্যবাপদ জানিয়ে উক্ত সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষনে ভবিষ্যতের ব্যাপক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ন্যাম ইরানের নেতৃত্বে সদস্যদেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপের পাশাপাশি বাংলাদেশও ইরানকে সমর্থন দেবে।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

৯ অক্টোবর, ২০১৩ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি সংস্কৃতি ও সম্পর্ক সংস্থার প্রধান ড. মোহাম্মদ বাকের খোররামশাদ এক রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি ১০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের ষষ্ঠতলায় ইরানি অর্থায়নে নির্মিত 'হাফিজ প্রাঙ্গন' এর শুভ উদ্বোধন করেন ।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী এক রাষ্ট্রীয় সফরে ইরান গমন করেন। তিনি সেখানে বাংলাদেশ ও ইরানের অংশিদারিত্বমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তার আমন্ত্রণে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খিস্টাব্দে ইরানি পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের মহিলা প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে সফর করেন।

১-৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ও আই সি'র তথ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালে ইরানের সংস্কৃতি মন্ত্রী আলী জান্নাতির সাথে তিনি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে জান্নাতি বাংলাদেশের সাথে সংস্কৃতি সম্পর্ক বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সিনেমা, থিয়েটার, মিউজিক, ভাস্কর্য শিল্প, সাহিত্য, বই এবং গণমাধ্যমসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করতে ইরান প্রস্তুত রয়েছে।[৭৪]

১৫ মে, ২০১৫ সালে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিটি ইরানের সংস্কৃতি মন্ত্রী আলী জান্নাতি ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর স্বাক্ষর করেন।[৭৫] চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন-

> বাংলাদেশ ও ইরান অভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার অংশীদার। উদাহরণস্বরূপ ফারসি ভাষার কথা বলা যায়, বাংলাভাষায় আট হাজারের মত ফারসি শব্দ রয়েছে এবং অধিকাংশ মানুষ জানেও না যে, এসব ফারসি ভাষার শব্দ। খ্যাতনামা ইরানি কবিগণ, যেমন: হাফেয, সাদি, মৌলানা রুমি প্রমূখ বাংলাদেশের জনগণের কাছে খুবই প্রিয়। আমাদেরকে সমকালীন ইরানি ও বাংলাদেশী লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে বন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। ইরান ও বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যও কাজ করা উচিত। দুদেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলে তা দুদেশের জনগণকে পরস্পরের আরো বেশী ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।[৭৬]

ইরান-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুদেশের মাঝে শিক্ষা সংস্কৃতির আদান প্রদান ব্যাপকতর লাভ করে। প্রতি তিন বছর পরপর এ চুক্তি নবায়ন করা হচ্ছে। গত ১৫ মে ২০১৫ সালে এ চুক্তিটি ইরানের সংস্কৃতি মন্ত্রী আলী জান্নাতি ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর পুনরায় নবায়ন করেন[৭৭]

৮. বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্কের গতি প্রকৃতি

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে দুই ধরনের পররাষ্ট্রনীতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালে পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যদিও বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের' সদস্য হয়। তথাপিও আদর্শগত দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের কথা সুবিদিত। আর দ্বিতীয় ধারাটি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর শুরু হয়। তাহল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। অনেকে মনে করেন সেই ধারা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল, ১৯৭৪ সালে মুজিব সরকারের পশ্চিমা ঘেঁষা নীতি এবং বিপ্লব পূববর্তী শাহ সরকারের সাথে মার্কিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিপ্লব পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্ক অটুট থাকে। বিপ্লব পরবর্তী ইরানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যা বাংলাদেশ ইরান সম্পর্কের দিক নির্দেশ করে। কিন্তু বাংলাদেশ এ সময় সতর্কতামূলক অবস্থানে থাকে। যার প্রমান জিম্মি সমস্যা। এক দিকে বাংলাদেশ যেমন নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী ইরানে আটককৃত মার্কিন কূটনীতিকদের মুক্তি দেয়াকে সমর্থন করেছে আবার ইরানের অভিযোগের আইন সংগত সমাধান চেয়েছে অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে ২য় ও আই সি সম্মেলনে যোগদানের প্রস্তুতি থেকেই এ নীতিগত পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়। পরবর্তীকালে সামরিক সরকারগণ ক্ষমতায় টিকে থাকার তাগিদে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন কাজটি এগিয়ে নেন। সংবিধান সংশোধন করে ২৫(২) ধারা যুক্ত করে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন কাজটি সাংবিধানিক করে নেন। ১৯৭৫ পরবর্তীতে পুরো আরব বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইরানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দাতা গ্রহিতার সম্পর্ক ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল বেকার, দরিদ্র, ও অদক্ষ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান। অপরদিকে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি কৃত উগ্র আধুনিকতা এবং ইরানের রাজকীয় সরকারের তেল সম্পদ উত্তোলনের জন্য প্রয়োজন ছিল সস্তা শ্রমিক। কর্মসংস্থান ও সাহায্যকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সাথে আরব বিশ্বের সম্পর্কেরও উন্নয়ন ঘটে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৭৬-১৯৭৯ এর মধ্যে জনশক্তি রফতানি ও আর্থিক সাহায্য প্রায় চারগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৭৯]

একইভাবে ইরানের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক এবং বিপ্লব পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব। বলা যায় ইরানের শাহ সরকার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুসরণকারী এবং বিপরীতক্রমে ইসলামি ইরান ছিল যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী। যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৯ সালের পূর্বে ইরানকে পারমানবিক শক্তি সহায়তা করতে চুক্তি করেছিল, সে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮০-৮৮ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল। ফলে বাংলাদেশ একদিকে মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্ননের মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য গ্রহণে মনোযোগী ছিল। এমতাবস্থায় ইরান যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী নীতি গ্রহণ করায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে ইরান- ইরাক যুদ্ধটি ছিল দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে । ফলে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

এসময় ধীরে চলো নীতি গ্রহণের বিকল্প ছিলনা। তবে ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক প্রয়াস ছিল লক্ষ্যণীয়।

১৯৭৯ সালে পূর্ববর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। ইরানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান, আমেরিকার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ইরান-আমেরিকার বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশিদারিত্ব খুবই ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। বিপ্লব পরবর্তীকালে ইরানের সাথে আমেকিার সম্পর্ক তিক্ততায় রূপ নিলেও ইরান-ইরাক যুদ্ধে ও আই সি ও জাতিসংঘের বিভিন্ন পদক্ষেপে বাংলাদেশের সক্রিয়তার ব্যাপারে আমেরিকার নিরবতা লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে ইরান-ইরাক যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিটিগুলোতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ সময়কালীন অস্থির সময় ইরান বাংলাদেশের দ্বিপক্ষিয় কোন কর্মকাণ্ড চোখে পড়েনা, শুধু শাহ সরকারের আমলে সম্পাদিত চুক্তি ও সমঝোতা মেনে দীর্ঘ এ সময় অতিবাহিত হয়। ১৯৮৮ সালে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন দুদেশকে কাছাকাছি নিয়ে আসে।

১৯৯০ সালে পরবর্তী বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুনরায় চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে লেনদেন শুরু হয়। কিন্তু এ সক্রিয় কর্মকাণ্ডে বাধা পড়ে ইরানের ওপর আমেরিকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে। ইরান, বাংলাদেশ ও আমেরিকার ত্রি-পক্ষিয় সম্পর্কের মাঝে ইরানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিকভাবে ইরানকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এর প্রভাব ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্কের মাঝেও প্রতিভাত হয়। তবুও ১৯৯০ সাল পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ও ইরানের মাঝে নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন খাতে সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। ১৯৯৫ সালে অক্টোবর মাসে ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রফসানজানি বাংলাদেশে ঐতিহাসিক সফর দুদেশের ধীর গতির সম্পর্ককে একটু গতি এনে দেয়। পরবর্তীতে তেহরানে অনুষ্ঠিত ১৯৯৭ সালের ৯-১১ ডিসেম্বর ও আই সির

Dhaka University Institutional Repository

৮ম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদান, ১৯৯৯ সালের ১-২ মার্চ ঢাকায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনে ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. হাসান হাবিবীর যোগদান, সর্বশেষ তেহরানে অনুষ্ঠিত ১৬ তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ এবং উক্ত সম্মেলনে ইরান সভাপতি ও বাংলাদেশ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে ইরান বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক পূর্বের ধারায় অটুট আছে বলে প্রতীয়মান হয়। ২০০২ সালে ইরান চট্টগ্রামে একটি তেল শোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলে আমেরিকার বিরোধিতায় তা আর হয়ে ওঠেনি। তবুও বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে ইরানের সক্রিয়তা ও সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে ছয় পরাশক্তির সাথে ইরানের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে নতুন করে বাংলাদেশে গ্যাস রফতানি, ত্রিদেশীয় আঞ্চলিক সড়ক ও রেল পরিবহন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সক্রিয়তার কথা আলোচিত হচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইরান বাংলাদেশের প্রাচীন এ সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

এ থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ইরানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। কর্মসংস্থান, অর্থনীতি,শিক্ষা, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উভয় দেশের মধ্যে অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশের মত ইরান থেকেও বাংলাদেশ সাহায্য সহযোগিতা, কর্মসংস্থান,ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে দুদেশের পারস্পারিক অগ্রযাত্তা অব্যাহত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. মনির উদ্দিন ইউসুফ (অনূদিত), *ফেরদৌসির শাহনামা*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৩৮।

২. Syed Ali Ahsan, *Muslim Traditions in Bengali Literature,* Islamic Foundatiuon, Dhaka, 1983, p. 18.

৩. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮, ২য় সংস্করণের ভূমিকা।

৪. এ. কে. এম আনোয়ারুল কবীর (অনূদিত), *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৩৭।

৫. লায়লা আফজালি (সম্পাদিত) *চাশমে আন্দাজ*, (মাসিক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), ২৭ তম সংখ্যা, ১৩৭৫ ইরানি সৌরবর্ষ, তেহরান, ইরান, পৃ. ৪৫।

৬. *নিউজ লেটার*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, (বাংলাদেশ ও ইরানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক) সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ. ২২।

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৪।

৯. *নিউজ লেটার*, প্রাগুক্ত, অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ. ২৫।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১১. ডক্টর এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

১২. ড. জীনাত আরা সিরাজী, *ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, যমযম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮২।

১৩. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, ৩৫, ইস্যু-২, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৩।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৫. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ. ২৮।

১৬. সালাহ উদ্দিন আহমদ ও অজয় রায় (সম্পাদিত), *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২১ তম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ৮৩।

১৭. *নিউজ লেটার*, মার্চ সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সৈয়দা ফরিদা পারভীন (সংকলিত)*পাণ্ডুলিপি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপি: একটি পর্যালোচনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৮।

১৯. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, ২য় সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০. মুহাম্মদ ইনাম উল হক (অনূদিত), *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান*, ইয়াহিয়া আরমাযানি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৪০।

২১. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক সংস্কৃতি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩১।*

২২. ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ.১-২।

২৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪২২।

২৪. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পাদিত), *শহীদুল্লাহ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ৫০৪।

২৫. *নিউজ লেটার, প্রাগুক্ত*, অক্টোবর -১৯৯৫, পৃ. ২৪।

২৬. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮২।

২৭. মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা* (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ২০০১, পৃ. ২১১।

২৮. *নিউজ লেটার, প্রাগুক্ত*, অক্টোবর -১৯৯৫, পৃ. ২৭-২৮।

২৯. কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩০৮।

৩০. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।

৩১. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯-৯০।

৩৩. *দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২০ আগস্ট, ১৯৭৫, পৃ. ১।*

৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, পৃ. ১।

৩৫. https://en.wikipedia.org/wiki/foreign_relations_of_Iran. Viwed 17/09/2015. 'Ministry of Forein Affairs, Islamic Republic of Iran" . 2008, Archived from the Original on 28 February 2009. Retrieved 8 November 2011.

৩৬. মনির উদ্দিন ইউসুফ (অনূদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

৩৭. কে. এম . রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫২২।

৩৮*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৪।

৩৯. *নিউজ লেটার, প্রাগুক্ত*, এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১৬।

৪০. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, (*ইরান ইরাক যুদ্ধে (১৯৮০-৮৮) বাংলাদেশের ভূমিকা*), সংখ্যা ৩১-৩২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৫৪৮।

৪১. নিউজ লেটার, আগস্ট, ১৯৯৫, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৪৩. জনাব চুফান (সাক্ষাৎকার), ইরানের দুতাবাসের ১ম কন্সাল জেনারেল, ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ।

৪৪. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সাহিত্য পত্রিকা*, সংখ্যা, ৩০শে জুন ১৯৯৬, বাংলা ভাষায় আরবী ফারসি শব্দ ও অভিধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৬৫।

৪৫. প্রফেসর কুলসুম আবুল বাশার (সম্পাদিত) *৭৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা*, ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮।

৪৬. *হাফিজ প্রাঙ্গন*, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, পৃ. ৮।

৪৭. *হাফিজ প্রাঙ্গন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ১।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, ৫ মার্চ, ১৯৭৬, পৃ. ১।

৫০. *প্রাগুক্ত*, ৯ মে, ১৯৭৬, পৃ. ১।

৫১. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ জুলাই, ১৯৭৬, পৃ. ১ ও ৭।

৫২. *প্রাগুক্ত*, ৪ আগস্ট, ১৯৭৬, পৃ. ১।

৫৩. *প্রাগুক্ত*, ২৭ জুলাই, ১৯৭৬, পৃ. ৮।

৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মাচ, ১৯৭৭।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, ৭ মার্চ, ১৯৭৭।

৫৬. *প্রাগুক্ত*, ৯ মার্চ, ১৯৭৭, পৃ. ১।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, ৯ মার্চ, ১৯৭৭, পৃ. ১।

৫৮. *প্রাগুক্ত*, ১১ মার্চ, ১৯৭৭, পৃ. ১।

৫৯. জনাব চুফান (সাক্ষাৎকার), ইরানের দুতাবাসের ১ম কন্সাল জেনারেল, ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ।

৬০. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ১০।

৬১. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃ. ৬৬।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২।

৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৬৬. *প্রাগুক্ত*, ১২ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৬৭. *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১১ অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ. ১ ও শেষ।

৬৮. প্রফেসর কুলসুম আবুল বাশার (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪ ও ৪৭।

৬৯. *নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ আগষ্ট ২০১২।

৭১. *প্রাগুক্ত*, ৩১ আগষ্ট, ২০১২।

৭২. *The Daily Star*, 31st August, p. 20, 19.

৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

৭৪. *নিউজ লেটার*, ৩৬ তম সংখ্যা, ইস্যু ৬, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃ. ২৪।

৭৫. *প্রাগুক্ত*, ৩৭ তম সংখ্যা, মে-জুন, ২০১৫, পৃ. ২৯।

৭৬. *প্রাগুক্ত*, ৩৭ তম সংখ্যা, মে-জুন, ২০১৫, পৃ. ২৯।

৭৭. *প্রাগুক্ত*, ৩৭ তম সংখ্যা, মে-জুন, ২০১৫, পৃ. ২৯।

78. The Bangladesh Observer, 2-3 March, 1980.

৭৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণাকর্মে মূলত ১৯৭১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে যে প্রাচীন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা শাসনতান্ত্রিক পট-পরিবর্তনের ফলে কখনো কখনো শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ শূন্যতা পূরণে ইরানের সূফি, পির-মাশায়েখগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তদুপরি এসম্পর্কের মাঝে যে সকল বিষয় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র গবেষণাকর্মে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ইরানের জাতিগোষ্ঠী আর্য হতে উদ্ভুত। প্রাচীন আর্যের দুটি শাখা ইরান ও ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করার ফলে এ দুটি জাতির ধমণীতে একই ধারার রক্ত প্রবাহমান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইরান ও বাংলাদেশের জনগণ একই সূত্রে গাঁথা।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ও ইরান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশাল দূরত্বে অবস্থান করলেও ইসলাম পরবর্তী যুগে মুসলিম শাসকদের মাধ্যমে এতদাঞ্চলে ইরানি শাসক ও জনগণকে একই সারিতে আবদ্ধ করে। ফলে এ অঞ্চলে ইরানি সূফি, পির-মাশায়েখদের ইসলাম প্রচার ও তাদের প্রভাবে প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর ইরান, আফগান ও তুর্কি শাসকদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বাংলাদেশ ও ইরান সম্পর্কের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ফারসিভাষী শাসক, ইসলাম প্রচারক এবং কবি সাহিত্যিকের আগমণের ফলে এ জনপদে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এ ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগীতায় অনেকাংশে সমৃদ্ধি লাভ করে। এছাড়াও শাসকদের অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে তাদের সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নানাভাবে প্রভাবিত করে যার ধারা এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ অর্থবিত্ত ও সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের এসকল অর্থবিত্তের প্রতি ইরানিরা আকৃষ্ট হয়। যে কারণে ইরানি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রাচীন শাসকগণ হত্যা, লুণ্ঠন ও অরাজকতা সৃষ্টি করে এদেশ থেকে সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

আহরণ করতো। সময়ের পরিবর্তন ও নানামুখি বির্বতনের ফলে দুই দেশের মধ্যে নবতর সম্পর্ক তৈরী হয়েছে যার ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

বিংশ শতাব্দির শেষপ্রান্তে এসে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন এবং ইরানের আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হলেও মূলত উভয় দেশের জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের মাধ্যমে সম্পর্কের অবস্থা একই বৃত্তে আবর্তন করেছে। এই দুটি আন্দোলনের সফলতার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ ও ইরানের আন্তঃসম্পর্ক ও মুসলিম দেশ হিসেবে একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ থাকার কারনে নতুন করে সম্পর্ক গতি লাভ করেছে। সকল প্রকার হীনমন্যতা ঝেড়ে আগামী দিনে এ দুই মুসলিম রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও বন্ধন অটুট থাকবে বলে আমরা আশা ব্যক্ত করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থাবলী

১. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

২. আন্দালিব রাশদী, *বিদেশির চোখে ১৯৭১*, নালন্দা, ঢাকা, ২০১৫

৩. আবুল হোসেন (অনূদীত), *ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৩।

৪. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭।

৫. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট*, কাকলি প্রকাশনি, ঢাকা, ১৯৯৬।

৬. আফসান চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার ইতিহাস-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৭. আফসার ব্রাদার্স (সম্পাদিত), *মহান একুশে ফেব্রুয়ারী ইতিহাস ও স্মৃতিচারণ*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১।

৮. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্পাদিত), *শহীদুল্লাহ রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫।

১০. অধ্যাপক মনজুরুল আলম খান, *আধুনিক ইরান(১৭৯৬-১৯৮৬)*, ঢাকা।

১১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, (অনূদীত), *আলোর পথে* (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা), ঢাকা, ১৯৮৯।

১২. এ. কে. এম আনোয়ারুল কবীর (অনূদিত), *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান*, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমন সাম্রাজ্য থেকে জাতীসত্ত্বা রাষ্ট্র*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যায় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা, ২০১১।

১৪. এম, এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক)*, বিশ্বদ্যিালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২।

১৫. এমাজ উদ্দিন আহমদ ও হারুন আর রশীদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩ (রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি)*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

১৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক সংস্কৃতি*,গতিধারা, ঢাকা, ২০০১।

১৭. কাজী জাহেদ ইকবাল, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭১-২০০১)*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১।

১৮. কে আলী, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৭৯।

১৯. কে. এম . রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৩।

২০. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৮।

২১. জগলুল আলম, *বাংলাদেশ বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯*, প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০।

২২. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৮।

২৩. ড. মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩।

২৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।

২৫. ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙগালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৪১৬ বাংলা সন।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. ড. জীনাত আরা সিরাজী, *ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, যমযম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২।

২৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্য*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২।

২৮. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১।

২৯. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং ক্রমবিকাশ*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা,২০০৮।

৩০. ড. তারেক মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, *ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা*, কেটিথ্রি পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৮।

৩১. ড. হামিদ আলগার, (একটি গোষ্ঠি কর্তৃক অনূদিত) *ইসলামী বিপ্লব ইরান দেশে*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৪৩৩ হিজরী সন।

৩২. ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২।

৩৩. নূর হোসেন মজিদী (অনূদিত), *ইরানের সমকালিন ইতিহাস*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা,১৯৯৬।

৩৪. প্রফেসর সালাহ উদ্দিন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

৩৫. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন ও তৎকালিন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৫।

৩৬. মুহাম্মাদ ইনাম-উল-হক, *বাংলার ইতিহাস ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯।

৩৭. মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১)*, গতিধারা, ঢাকা, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. মোঃ কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: উৎস অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২।

৩৯. মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০০৭।

৪০. মোঃ ফায়েক উজ্জামান, *ইরান-ইরাক বিরোধ যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক যুদ্ধ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮।

৪১. মোঃ আবদুল হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫ ।

৪২. মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩।

৪৩. মুহাম্মদ ইনাম উল হক (অনূদিত), *মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান*, ইয়াহিয়া আরমাযানি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮।

৪৪. মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৪৫. মনির উদ্দিন ইউসুফ (অনূদিত), *ফেরদৌসির শাহনামা*, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২।

৪৬. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮।

৪৭. মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা* (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ২০০১।

৪৮. মোঃ কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: উৎস অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২

৪৯. মেজর অবঃ রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫।

৫০. রাখালদাস বন্দোপধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বইপত্র, ঢাকা, ২০১৩।

৫১. শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রনাঙ্গণ*, ঢাকা, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবি-শার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০১।

৫৩. শারমিন খান সুবর্ণা (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা, ২০১১।

৫৪. শফিকুর রাহি, *মহাকালের মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, মিজান পালিশার্স, ঢাকা, ২০০৯।

৫৫. সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী (অনূদীত), *পাহলভী রাজবংশের উত্থান পতন* (জেনারেল হোসেইন ফেরদৌসের স্মৃতিচারণ), জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা, ২০০১ ।

৫৬. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৩।

৫৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

৫৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১১ তম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১

৫৯. সুখময় মুখোপধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬)*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ২০০৫।

৬০. আলী আকবর দেহখোদা, ডাঃ মোহাম্মদ মুঈন (সম্পাদিত),*লুগাতনামে*, তেহরান, দানেশগাহে তেহরান, ১৩৪২ হি. শা.

৬১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

৬২. সৈয়দ হোসাইন মোহাম্মদ জাফরী, (অনু.) মনজুর আলম, *শিয়া মাজহাবের উৎপত্তির ইতিহাস*, ঢাকা, মাসুম পাবলিকেশন, ১৯৯২।

৬৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আবু নদভী, *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, অনু.-আবু সাঈদ মোহাম্মদ উমর আলী, ১ম খণ্ড, মোহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩।

৬৪. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব*, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪।

৬৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ২০১২।

৬৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, নবম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১।

৬৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, দশম খণ্ড বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১

৬৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, বার খণ্ড বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১

৭০. তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর*, মাওলা ব্রাদার্স, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৯।

৭১. ড. আশফাক হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, নিউ এজ, ২০১৪।

৭২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব: তুরুস্ক-ইরান-আফগানিস্তান*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১০।

৭৩. আবদুস সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ঢাকা, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

৭৪. হাসান আল চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী,১৯৯৩।

৭৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

1. Abul Kalam (ed.), *Bangladesh: Internal Dynamics and External Linkages,* Dhaka, University Press Limited, 1996.
2. Donald N. Wilber, *Iran Past Present,* Princeton University Press, New Jersey, USA, 1976.
3. E.G Browne, *A literary History of Persia,* Vol-1, Cambridge University Press, London, 1929.
4. El Azhary(edited), *The Iran Iraq war,* Croom Helm, London & Canberra, 1984.
5. H.E. Chehabi, *Iranian Politics and Religious Modernism* (The Liberation movement of Iran Under the Shah and Khomeini), I.B tauris & co. Ltd., London, 1999.
6. John D. Stempel, *Inside The Iranian Revolution,* Indiana University press, Bloomington, USA, 1981.
7. Masih Muhajeri, *Islamic Revolution: Future Path of the Nations,* The External Liaison Section of the Central office of JIHAD-E-SAZANDEGI, Tehran, Iran, 1983.
8. M.S. EL Azhary Ed., *The Iran Iraq war: an historical, Economic and Political Analysis,* Croom Helm Ltd. London, 1984.
9. Rounak Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration,* University Press ltd., Dhaka, 2001.
10. Reza Shah Pahlovi*, Mission for my country,* Hutchinson & co. Ltd., London, 1961.

Dhaka University Institutional Repository

11. Roger Howard, *Iran in crisis? Nuclear ambitions and the American response,* Zed Books ltd., London, 2004,
12. Suroosh Irfani, *Revolutionary Islam in Iran* (Popular Liberation or Religious Dictatorship), Zed Book Ltd., London, 1983.
13. S. M. Imamuddin, *A Modern history of the Middle east and North Africa,* Najmasons Ltd., Dacca, 1968.
14. Sepehr Zabin, *Iran Since The Revolution,* Croom & Helm, London & Canberra, 1982.
15. Syed Ali Ahsan, *Muslim Traditions in Bengali Literature,* Islamic Foundatiuon, Dhaka, 1983.
16. Sayed Abul Hasan Ali nadwi (trans. by Mohammad Asif Kidwai), *Muslims in India,* Islamic Research and Publications, Lucknow, India, 1980.
17. Shireen Hasan Osmany, *Evolution of Bangladesh,*A.H. Development Publishiling House, Dhaka, 2014.
18. The Iraqi Regime upon the Islamic Republic of Iran, *A Review of The Imposed War,* Embassy of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, Dhaka, 1983.
19. W.B. Fisher Edited. *The Cambridge History of Iran,* Vol. 1, Cambridge University Press, New york, 1968.
20. Parviz Daneshvar, *Revolution in Iran,* Macmillan Press Ltd., London, 1996.
21. Kennth Katzman, *Iran's Foreign Policy,* Congressinoal Research Service, June 30, 2015.

Dhaka University Institutional Repository

22. Muhammad Shamsul Haq, *Bangladesh in International Politics,* (Dhaka: The University Press Ltd. 1993
23. *Encyclopedia of U.S. Foreign Relations,* (Oxford University Press, Oxford, New York), Vol. 2.
24. Dilara Choudhury, *Bangladesh Foreign Policy outlook: Religional and International Settings in Bangladesh, South Asia and the World,* ed. Emajuddin Ahamed and Abul kalam (Dhaka: Academic Publishers, 1992),
25. Imtiaz Ahmed, "A Projection of the Eynamism of Bangladesh-United States Relations" Mohammad Mohabbat Khan adn Syed Anwar Husain (eds.), Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy (University of Dhaka, Centre for Administrative Studies, 1986),

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি গ্রন্থাবলী

১. লায়লা আফজালি (সম্পাদিত), *চাশমে আন্দাজ,* (মাসিক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা), ২৭ তম সংখ্যা, ১৩৭৫ ইরানি সৌরবর্ষ, তেহরান, ইরান।

২. গোলাম রেজা কোরবাচাচী (সম্পাদিত), *হাফ্ত হাজার রোজে তারীখে ইরান ওয়া ইকলাবে ইসলাম* (ইরান ও ইসলামী বিপ্লবের সাত হাজার দিনের ইতিহাস) ২য় খণ্ড, বুনিয়াদে তারীখে ইসলাম ইরান, কোম, ইরান, ১৯৭১।

৩. নাসের আযিমী দোবাখশারি, *জুগরাফিয়ে ইরান* (ইরানের ভূগোল), ইরানি শিক্ষা মন্ত্রনালয়, তেহরান।

৪. আলী আকবর দেহখোদা, ডাঃ মোহাম্মদ মুঈন(সম্পাদিত)-*লুগাতনামে*, তেহরান, দানেশগাহে তেহরান, ১৩৪২ হি. শা.।

৫. মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানী, *আদাবনামেয়ে ইরান*, লাহোর, নিগারিশাত, তা. বি.।

৬. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, (অনূদীত), *আলোর পথে (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা)*, ঢাকা, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্রিকা

১. সালাহ উদ্দিন আহমদ ও অজয় রায় (সম্পাদিত), *ইতিহাস,* বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২১ তম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৯৮৭।

২. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৩০ জুন ১৯৯৬।

৩. প্রফেসর কুলসুম আবুল বাশার (সম্পাদিত), *৭৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা*, ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

৪. *হাফিজ প্রাঙ্গন*, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

৫. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইরানের ভূমিকা), *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৩১-৩২, ২০০৯।

৬. *আলোর স্মারক, ইতিহাসে চীরভাস্বর অবয়ব খোমেনী,* ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০।

৭. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, মো: মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ নজীব উল্লাহ সাকী, (*ইরান-ইরাক যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা*), ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা, ৩১-৩২ ঢা. বি. ২০০৯।

৮. সৈয়দা ফরিদা পারভীন (সংকলিত), *পাণ্ডুলিপি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফারসি পাণ্ডুলিপি: একটি পর্যালোচনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১২।

৯. Frank Cass, *Middle Eastern Studies,* London, Modernization and Development in Iran, Volume-32, Number-3, July, 1996.

১০. Sabiha Hasan, Foreign Policy of Bangladesh-II, *Pakistan Horizon*, Vol. XXXVI, No. 4, 1983.

Dhaka University Institutional Repository

১১. Imtiaz Ahmed, "A Projection of the Eynamism of Bangladesh-United States Relations" Mohammad Mohabbat Khan and Syed Anwar Husain (eds.), *Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy*, University of Dhaka, Centre for Administrative Studies, 1986.

১২. Mansoor Limba (Translated), The Institute for Compilation and Publication of Imam KomeinI's Works (International Affairs Department), *Theoritical Viewpoints of Imam Khomeini in the Realm of Foreign Policy,* 2006.

দৈনিক ও মাসিক পত্র পত্রিকা

১. *দৈনিক দেশ।*

২. *দৈনিক ইত্তেফাক।*

৩. *দৈনিক আজাদ।*

৪. *দৈনিক আজকের কাগজ।*

৫. *বিচিত্রা।*

৬. *The Daily Star.*

৭. *দৈনিক বাংলা।*

৮. *দৈনিক পাকিস্তান।*

৯. *নিউজ লেটার।*

১০. *News Letter.*

১১. *The Bangladesh Observer.*

১২. *The Dawn.*

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার

১. ইরানের দূতাবাসের ১ম কন্সাল জেনারেল, ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ।

ওয়েব সাইট

1. http://www.dghs.gov.bd/licts_file/images/Health_Bulletin/HB2012_CH/HB2012_CH1_BD-at-a-glance.pdf
2. https://www.google.com.bd/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=national+population+and+housing+census+2011+national+report+of+Iran
3. https://en.wikipedia.org/wiki/foreign_relations_of_Iran. Viwed 17/09/2015. 'Ministry of Foreign Affairs, Islamic Republic of Iran". 2008, Archieved from the Original on 28 February 2009. Retrieved 8 November 2011.
4. https://www.google.com.bd/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=national+population+and+housing+census+2011+national+report+of+Iran.

Dhaka University Institutional Repository